মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২
১৮শ বর্ষ
একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমূখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

বিশেষ সংখ্যা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"শিশু-কিশোরদের দরবারে আনা নেওয়া ভাল।
এতে তাদের আদব আখলাক বুঝ জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে"

-বিশ্বঅলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

নানানভাবে
নতুন জিনিস
শিখছি
দিবা রাত্র

মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক
গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সুফি

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র

বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে

শিশু কিশোর সমাবেশ

ও পুরস্কার বিতরণী

স্থান: নাসিরাবাদ সরকারী (বালক) উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ

নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২০, ১৭ জানুয়ারি ২০১৪

শুক্রবার সকাল ৯.৩০টা

ব্যবস্থাপনায়:

মাইজভাণ্ডারী একাডেমী

গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি: নং ২৭২, ১৮শ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা

ডিসেম্বর- ২০১৩ ঈসায়ী
মুহাররম-সফর - ১৪৩৫ হিজরী
অগ্রহায়ণ-পৌষ - ১৪২০ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক
মো: মাহবুব উল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: 01818 749076
01716 385052
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: 01819 380850
01711 335691

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

২৯

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়: শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর খোশরোজ ও স্বাধীন বাংলাদেশ ---------- ২
■ খোশরোজ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
– মাওলানা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী ---------- ৩
■ আমার চেতনায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
– অধ্যাপক এ.ওয়াই.এম. জাফর ---------- ৭
■ হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রঃ)'র জীবন ও কর্ম ঃ আধ্যাত্মিকতার আলোকে
– ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী ---------- ৯
■ সত্যের আলোকধারা শাহানশাহ্ হযরত
– ড. মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ---------- ১৩
■ স্মৃতিচারণ : শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক (রহঃ) কে যেভাবে দেখেছি
– মোঃ সিরাজুল ইসলাম ---------- ১৫
■ মাইজভাণ্ডার শরিফকে ঘিরে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় নিবেদিত জনাব জামাল আহমদ সিকদারের স্মৃতিচারণ ---------- ১৬
■ আত্‌তাওজিহাতুল্ বহিয়্যাহ্ বা সিজ্‌দাহ্ তাহিয়্যার সুপ্রমাণ পুঞ্জ
– অনুবাদ: এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী ---------- ১৯
■ মাজার শরিফে ফুল দেয়া, গিলাফ চড়ানো, বাতি জালানো, গোলাপ জল ছিটানো প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান
– আলহাজ্ব মুফতী বাকীবিল্লাহ্ আযহারী ---------- ২২
■ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা: সর্ববেষ্টনকারী ত্বরীকা
– আবুল ফজল মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ্ সুলতানপুরী ---------- ২৫
■ শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কু:) এর "তাছনিফাত"
– শাহ্‌জাদা মাওলানা সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ্ ফরহাদাবাদী- ২৯
■ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
– মোঃ মাহবুব উল আলম ---------- ৩২
■ বিপন্ন মানবতা ঃ আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের শিক্ষা
– অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ---------- ৩৪
■ "মাহে সফর এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আমল"
– সৈয়দ আবু আহমদ ---------- ৩৬
■ আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়
– অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী -- ৩৮
■ আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'
– অনুবাদ: বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর ---------- ৪১
■ ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব -০৫
– সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান ---------- ৪৪
■ মুনিবের কদমে উৎসর্গীত হওয়ার চেয়ে বড় হাদিয়া আর কিছু হতে পারে না ---------- ৪৬

সম্পাদকীয়...

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর খোশরোজ ও স্বাধীন বাংলাদেশ

ঈসারী ডিসেম্বর তথা বাংলা পৌষ মাস আমাদের বাংলাদেশের জন্য বয়ে আনে স্বাধীনতার সাওগাত। অথচ এই মাসটিই মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তদের জন্য স্বাধীনতার আনন্দের পাশাপাশি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র জন্ম মাস হিসেবে আনন্দ-আলোকের ঝর্ণাধারা হিসেবে বরিত। আমরা আজকের এই আনন্দের মাসেও বিষন্ন মনে স্মরণ করি আমাদের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদানকে। কামনা করি তাঁদের রুহের মাগফেরাত। আর একই সাথে মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক গগনে তথা বিশেষ আধ্যাত্ম আকাশের অন্যতম প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) আবির্ভাবে জানাই আল্লাহ্র শোকরিয়া। এই মাসে স্বাধীন বাংলাদেশ ও শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র খোশরোজ শরিফ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ এর আবির্ভাবের প্রক্রিয়ার সাথে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহসূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) থেকে শুরু করে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সমেত প্রত্যেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ধারাবাহিক সম্পৃক্ততার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত আকারে বিদ্যমান। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) একদা সিয়াসত বা প্রশাসন পূর্বাঞ্চলে (পূর্ববঙ্গে) স্থানান্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন কোলকাতার পূর্ববঙ্গ বাসীদের বহুবিধ দুরবস্থা অবলোকন করে। হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা তাঁর রহস্যাবৃত বহুমুখী কার্যকলাপের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে স্বাধীন পৃথক রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার উপাদানের যোগান দিয়েছিলেন। এসব বিষয়ে আরো লিখিত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। খাদেমুল ফোকারা হযরত শাহ্সূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্রকাশ্য অনেক কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশের স্বাধীন আবির্ভাবের কেবল পথ নির্দেশকই নয়, উপরন্তু গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক হিসেবে ইতিহাসে স্থিত আছে। এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ এক মহান অভ্যুদয়ের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঐ অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসেন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এই মহান দরবারের আকাশে কেবল স্বাধীন বাংলাদেশের লড়াকু পতাকা উত্তোলন করেই ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু হানাদার বাহিনীর সাথে প্রকাশ্য দিবালোকে ঝুঁকিপূর্ণ এনকাউন্টারের মুখোমুখিও হন। সমস্ত হানাদার বাহিনীর উদ্ধত সৈনিকদের সম্মুখে নিরস্ত্র নিরীহ এই মহান আধ্যাত্ম সাধক ও মানবতার সেবকের প্রশান্ত প্রতিরোধের ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবল নৈতিক শক্তির উৎসধারা হিসেবে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে দেখা গেছে, বহু মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও নিরাপত্তা-বর্ম হিসেবে এভাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের এক অনবদ্য অংশ হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফই কেবল নয়, এই মহান দরবারের (কঃ) ওলী-আল্লাহ্দের খলিফাবৃন্দকে কেন্দ্র করে যে আধ্যাত্ম দরবার গড়ে উঠেছে। সেগুলোকেও আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গেছে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ এবং এই যুদ্ধকালীন ইতিবাচক ভূমিকায় যে প্রধান বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তাহলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনাই কেবল নয়, উপরন্তু তাঁদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চেতনাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নৈতিক-সামাজিক এবং কার্যতঃ রাজনৈতিকভাবে প্রবল প্রেরণাদায়িনী সংগ্রামী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে; যার কণ্ঠে এ দেশের মাটি, আকাশ, বাতাস, পানি, বৃক্ষ-লতা এমনকি প্রাণীকুলকেও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী হিসেবে পাওয়া গেছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সমকালীন ভূমিকাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (কঃ) আমাদের স্বদেশ ভূমি বাংলাদেশ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী হিসেবে দেখেছি। বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি নির্দেশ করে তিনি একজন দূরদর্শী অর্থনীতিবিদের মতোই বলতেন, বাংলাদেশ দরিদ্র নয়। তিনি বাংলাদেশের সমূহ সম্পদের যথাযথ বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পিত সদ্ব্যবহারের তাগিদ দিয়ে গেছেন। আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে মানবতাবাদী চেতনার ধারক মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের এই রাষ্ট্র-জাতিস্যোতক অবস্থান আমাদের টিকে থাকার এবং এগিয়ে যাবার পথে অন্যতম প্রধান অবলম্বনও বটে। যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের এই আনন্দের ক্ষণে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে অপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র পবিত্র খোশরোজ শরীফে আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ এর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাঁর তথা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের মহান আউলিয়া কেরামের নজরে করম কামনা করি।

খোশরোজ শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

• মাওলানা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন চিশ্‌তী •

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যীন, ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলিয়ায়ে উম্মাতিহী আজমাঈন। দুনিয়ার মোহে অন্ধ মানবজাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালা যুগে যুগে নবী ও রসূলগণকে এ ধরাধামে পাঠিয়েছেন। হযরত রাসূল করিম (সাঃ) এর পর থেকে নবী ও রসূল আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং হযরত রসূল করিম (সাঃ) সর্বশেষ কিংবা আখেরী নবী হিসেবে রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত হন। কিন্তু নবী প্রেরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলেও মানুষের তমসার রাত কেটে যায়নি। পথহারা মানুষকে মিথ্যে মোহ থেকে মুক্তি দেবার জন্য, আলোর দিশা দেবার জন্য, পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালনের জন্য, আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে গাউস, কুতুব, অলী বেশে হাদী বা পথ প্রদর্শক প্রেরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। ওলী আল্লাহ্‌গণ হচ্ছেন নবীর প্রতিনিধিত্বকারী বা "ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া।" ওলী-আল্লাহ্‌গণ রসূল (সাঃ) এর নিকট থেকে বেলায়তের দায়িত্ব প্রাপ্ত। যার সূচনা করেছিলেন মুশকিল কোশা মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী (রাদ্বিঃ)কে দিয়ে

عن زيدابن ارقم عن النبى ﷺ قال من كنت مولاه فعلى مولاه

অর্থঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকম (রাদ্বিঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন আমি যার মাওলা, তার জন্য আলী (রাদ্বিঃ) মাওলা (তিরমিযী শরীফ ২:২১৩ পৃঃ) অতঃপর হুজুর (সাঃ) মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করে বললেন- হে আমার আল্লাহ্! যে আলীকে ওয়ালী জানবে, তুমি তার জন্য ওয়ালী হয়ে যাও। অর্থাৎ যে আলীর (রাদ্বিঃ) সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, তুমি ও তার বন্ধু হয়ে যাও। আর যে আলীর (রাদ্বিঃ) সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তুমি তার জন্য শত্রু হয়ে যাও। যে আলী (রাদ্বিঃ) কে সাহায্য করবে তুমিও তাকে সাহায্য কর আর যে আলীর (রাদ্বিঃ) সাথে থাকবে, তুমিও তার সাথে থাকো। রসূল করিম (সাঃ) আরো এরশাদ করেছেন। انا مدينة العلم وعلى بابها অর্থাৎ- আমি (রাসূল) এলমের শহর এবং আলী (রাদ্বিঃ) তাঁর দরজা (তারিখুল খোলাফা-১১২ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় নবুয়্যত ও বেলায়ত একটি অপরটির সম্পর্ক শরীর ও রূহ এর মত। রাসূল (সাঃ) এর ছায়া হল বেলায়ত, পেয়ারা নবী নুরানী জবানে এরশাদ করেন। الولاية ظل النبوة অর্থাৎ: বেলায়ত হল নবুয়তের ছায়া, আরো গভীর চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই বেলায়ত যারা হাসিল (অর্জন) করেন তাদেরকে ওলী বলা হয় আর রাসূল পাক (সাঃ) এর মোবারক নাম সমূহের একটি নাম হল ওলীয়ুন (সাঃ), (আসমায়ে মুস্তফা- ৩১৮ পৃষ্ঠা) সুতরাং রাসূল মকবুল (সাঃ) এর বিকাশ হলেন আউলিয়ায়ে কেরাম।

الشيخ فى قومه كالنبى فى امته অর্থাৎ- উম্মতের জন্য নবী যেমন, মুরিদের জন্য বা গোলামদের জন্য পীর বা ওলীগণও তেমন (হাদীস) আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহঃ) বলেন,

انبياء واولياء راحق بدان + سر مخفى بالو كردم من عيان

অর্থাৎ: নবী এবং ওলীগণকে, আল্লাহ্ পাকের ঝলওয়া আফরোজ বিরাজ স্থান মনে কর। এই গুপ্ত রহস্য আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। (মসনবীয়ে মাওলানা রুমী) নবী ও ওলীগণের দায়িত্ব একটাই শুধুমাত্র মানব জাতিকে হেদায়াত করা বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক স্থাপন করা, نفس حيوانى থেকে نفس مطمئنه পয়দা করা, তাই রাসূল (সাঃ) এর আগমন যেমনিভাবে আমাদের জন্য রহমত। অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামগণ এর আগমনও আমাদের জন্য রহমত। রাসূল পাক (সাঃ) এর আগমনের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে যে অনুষ্ঠান বা মাহ্‌ফিল করা হয় তাকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) বলা হয়। আর আউলিয়ায়ে কেরামগণের জন্ম বা আগমনের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে যে অনুষ্ঠান বা মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয় তাকে খোশরোজ শরীফ বলা হয়।

খোশরোজ শরীফের গুরুত্ব: (خوش روز) খোশরোজ শব্দটি ফারসী এর শাব্দিক অর্থ হল خوش মানে খুশি বা আনন্দ روز মানে দিন বা তারিখ شريف মানে সম্মানী বা পবিত্র। যৌগিক বা পুরো অর্থ হল, (خوش روز) খোশরোজ শরীফ অর্থ পবিত্র বা সম্মানী খুশির দিন। নবী ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ এর আবির্ভাব দিবসটি হল পুরো মুসলিম মিল্লাতের জন্য পবিত্র খুশির দিন। তাঁরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতি বা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে রহমত স্বরূপ দুনিয়াতে আবির্ভূত হন। ঐ রহমতের সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক জমিনবাসীকে জানিয়ে দেন। وما ارسلناك الا رحمة للعلمين অর্থাৎঃ হে রাসূল (সাঃ) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া ১০৭ নং

আয়াত) এতে বুঝা গেল যে হুযুর (সাঃ) সমস্ত জগতের জন্য রহমত হুযুর (সাঃ) এর ওফাতের পরও জগতে তাঁর রহমত বলবৎ রয়েছে আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল করিমে ইরশাদ করেছেন, ان رحمة الله قريب من المحسنين অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্'র রহমত-অনুগ্রহ সৎ কর্মশীল (ওলী আল্লাহ্) গণের অধিক নিকটে (সূরা আরাফ ৫৬ নং আয়াত) সুতরাং রসুল করিম (সাঃ) যেমন সমগ্র জাহানের জন্য রহমত অনুরূপভাবে নবীর প্রতিনিধিত্বকারী বা "ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া" ওলী আল্লাহ্গণও সমগ্র জাহানের জন্য রহমত যা বর্ণিত সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর সে রহমত প্রাপ্তির দিন বা তারিখকে উপলক্ষ করে খুশি উদ্‌যাপনের জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান-

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

অর্থাৎ- হে হাবীব আপনি বলুন, আল্লাহ্রই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেটারই ওপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলতের চেয়েও শ্রেয় (সূরা ইউনুস ৫৮ নং আয়াত) এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্তা'লা আমাদের প্রতি আদেশ করেছেন যেন আমরা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা প্রাপ্তিতে খুশি প্রকাশ করি তাই আমরা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনের জন্য রাসুল পাক্তির দিনকে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), ও ওলীগণের আগমনের দিনকে খোশরোজ শরীফ হিসেবে পালন করে থাকি। আমাদের দেশে অনেক ভদ্র লোক আছেন যারা হয়ত একথা বলতে পারেন যে, রাসুল পাক (সাঃ) রহমত কিন্তু আউলিয়ায়ে কেরামগণ রহমত নয়। তাদের জওয়াবে বলতে পারি:

(১) হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যকরিয়া মুলতানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৫৬৫ - ৬৬৫ হিজরী) এর ভাষায়,

دستگیر بیکسان و چارۂ بیچارگان + شیخ عبدالقادر است آں رحمة للعالمین

এখানে শায়খ বাহাউদ্দীন যকরিয়া মুলতানী (রহঃ) হুযুরে গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)কে রাহমাতুল্লিল আলামীন বলেছেন। (মাজহারে জামালে মুস্তফায়ী ৯৬ পৃ:) (২) ইমামুল আইম্মা বাহরুল উলুম মুফতীয়ে আযম আল্লামা শাহ্সূফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) এর ভাষায়,

اشرف المخلوق فی هذا الزمان + رحمة للعالمین ظل الامان

আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহঃ) এখানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কে এ যুগের সৃষ্টির সেরা মানব, ও প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য রহমত ও শান্তির ছায়া বলেছেন। অর্থাৎ রাহমাতুল্লিল আলামীন বলেছেন। (তোহফাতুল আখ্ইয়ার ফি দাফ্-ই শাররোতিল অশেরার ১ম খন্ড ১৪পৃষ্ঠা)।

অতএব, রাসূল (সাঃ) ও আওলাদে রাসুল, নায়েবে রসুল পীর আউলিয়া সালেহীন বান্দাগণ জমিনে তশরীফ আনা জমিনবাসীর জন্য রহমত তাই ঐ দিনকে উপলক্ষ করে খোশরোজ শরীফ উদ্‌যাপন করা মিলাদ কিয়াম দরুদ সালাম সেমা জিকির করা নারায়ে তক্‌বির, নারায়ে রেসালত নারায়ে গাউসিয়া স্লোগান আদায় করা এটা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ। যে তারিখে বা যে দিনে আল্লাহ্র কোন নেয়ামত পাওয়া যায়, সে তারিখ বা দিন কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদাবান হয়ে যায়। ঐ তারিখে আনন্দ উৎসব করা, খুশিতে ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন আল্লাহ্তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادرک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি কুরআন মজিদ কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। কদরের রাত সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (সূরা কদর ১,২,৩, নং আয়াত) এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে কদরের রাত ও রমযান মাস অন্যান্য মাসসমূহ থেকে উত্তম। এ মাসের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এটা ছাড়া অন্যান্য মাসের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তা একমাত্র এজন্য যে এ মাস ও এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন তো একবারই অবতীর্ণ হলো। কিন্তু এ মাস এ রাত সব সময়ের জন্য মর্যাদাবান হয়ে গেল। কুরআন নাযিলের কারণে যদি এ মাস এ রাত এত মর্যাদবান হয়। আল্লাহ্র ওলীগণ আগমনের দিন বা রাতটি মর্যাদাবান হবেনা কেন? তাই মুশ্‌কিল কোশা হযরত আলী বেলায়তের জবানে ইরশাদ করেছিলেন "হাযাল কুরআনু সামিতুন ওয়া আনাল কুরআনু নাতিকুন" অর্থাৎ- 'এ কুরআন নির্বাক এবং আমি সাবাক (জীবন্ত) কুরআন। যদি এই নির্বাক কুরআন নাযিলের জন্য রমযান বা লাইলাতুল কদর এত বেশী মর্যাদাবান হয়। যারা জীবন্ত কুরআন যাদের মাধ্যমে এই কুরআনের বাস্তবায়ন। যাদের জবান থেকে বের হওয়ার কারণে কুরআন এত সম্মানিত যাদের দরবারে সার্বক্ষনিক কুরআনে তেলওয়াত। যাদের দরবারে কুরআনের সঠিক শিক্ষা প্রদান করা হয় ঐ ওলির খোশরোজ শরীফ পালন করা কতটুকু প্রয়োজন তা আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখলাম। আজকে বিশ্বের মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই কিছুসংখ্যক নামধারী মুসলমান যাদের জবানে কুরআন আবার তারা মানুষ হত্যা করে, যাদের সিনায় কুরআন তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত করে। একদিকে কুরআনের শিক্ষা দেয় আবার ঐ মাদ্‌রাসায় বোমা

বানানো শেখায়। আজ তাদের কারণে এই পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয়েছে। কুরআন তারা পড়লেও কুরআনের আদর্শ, সঠিক শিক্ষা তাদের মাঝে নেই তাদের কারণে পবিত্র কুরআন কলংকিত তাই যাদের আগমনের কারণে কুরআন শরীফের মহান শিক্ষার বাস্তব রূপায়ন হয়েছিল তাদের আগমনকে উপলক্ষ করে খুশী উদ্‌যাপন করা, হাদিয়া, নজরানা, জিকির, আজকারের মধ্য দিয়ে খোশরোজ শরীফ পালন করা এটা উত্তম ইবাদত। আল্লাহ্ পাক এটাকে সকল অর্জিত সম্পদ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

খোশরোজ শরীফ পালনের মধ্য দিয়ে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়:

আল্লাহ্‌তা'য়ালার নেয়ামত সমূহ ও তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের কারণে তাঁরই শুকরিয়া জ্ঞাপন করা এবাদতের দাবি। পবিত্র কুরআন মজীদে এর একটি দর্শন ও উপকারিতা বয়ান করা হয়েছে যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد অর্থাৎ- যদি তোমরা শোকরিয়া জ্ঞাপন কর তা হলে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা (নেয়ামতের) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে অবশ্যই আমার আযাব কঠিন। (সূরা ইব্রাহীম ১৩ পারা) বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক দিনে আরাফার ময়দানে ঘোষণা করা হয়েছে-

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

অর্থ- আজকের দিনে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের জীবন বিধানকে এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি (সূরা মায়েদাহ্ আয়াত- ৩)। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র নেয়ামত জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করতে হয়। সে সমস্ত নেয়ামতের দিকেই এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হয়, কখনো তার নাফরমানী না করে। (তাফসীরে নুরুল কুরআন ২১ পারা, ৫৭ পৃষ্ঠা) আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ্‌র অলিগণও আছেন তাই তাদের আগমনের দিনকে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে শোকরিয়া সরূপ আনন্দ প্রকাশ করা কুরআনের নির্দেশ। আরাফাতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নীরবে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বললেন- এই আয়াতে নবী করিম (সাঃ)'র বিদায়ের আশংকায় কাঁদছি। হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফত কালে একজন ইয়াহুদী পাদ্রী তাঁর দরবারে এসে বলল "হে আমিরুল মোমেনীন! আপনারা আপনাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, যদি সেই আয়াতটি আমরা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হতো তা হলে আমরা ঐ দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম" হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- "সে আয়াতটি কী? ইয়াহুদী বললো 'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম' আয়াত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন- উক্ত আয়াতটি যে দিনে নাযিল হয়েছিল তা আমার স্মরণ আছে- দুই ঈদের দিনে অর্থাৎ, আরাফাতের দিনে ও জুমার দিনে। কিছু জাহেল লোক বলে, দুই ঈদ ছাড়া শরীয়তে তৃতীয় কোন ঈদ নেই। তাদের জানা উচিত জুমার দিন আরাফার দিনও হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা মোতাবেক ঈদের দিন। এভাবে মিলাদুন্নবী দিনও ঈদের দিন ঈদের দিন ৯টি (১) ঈদে রমযান (২) ঈদে কুরবান (৩) ঈদে জুমুয়া (৪) ঈদে আরাফাহ্ (৫) ঈদে লাইলাতুল বারাআত (৬) ঈদে লাইলাতুল ক্বদর (৭) ঈদে আশুরা (৮) ঈদে নুযুলে মায়েদাহ্ (৯) ঈদে মিলাদুন্নবী বা ঈদে ইয়াওমের বেলাদত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অলিদের বেলায়ত, বা জন্ম দিন যাকে খোশরোজ শরীফ বলা হয়। (গুনিয়াতুত্বালেবীন, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, মাওয়াহিব, মাদারিজুন্ নবুওয়্যত) আর আউলিয়ায়ে কেরামগণের খোশরোজ পালন করা এটা রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে এরশাদ ফরমান-

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب অর্থাৎ- এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করবে তা তো তার অন্তরের তাকওয়া সঞ্জাত। (সূরা হজ্ব আয়াত ৩২) সুতরাং অলি আল্লাহ্‌কে সম্মান করা মুত্তাকির নেয়ামতের স্মরণ করে তার শোকর জ্ঞাপন করা শুধুমাত্র উম্মতে মোহাম্মদী (সাঃ)'র উপর ওয়াজিব নয় বরং পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও এ বিষয়ে আদেশ করা হয়েছিল যেমন, বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল,

يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم وانى فضلتكم على العالمين

অর্থাৎ- হে বনী ইসরাইল! আমার এসব করুণারাজির কথা স্মরণ করো যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি আর আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর মর্যাদাবান করেছি। (সূরা বাক্বারা আয়াত ৪৮) আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন-

وذكرهم بايام الله ان فى ذالك لايت لكل صبار شكور

হে মুসা, বনী ইস্‌রাইলকে আল্লাহ্‌র সে দিন সমূহের কথা

স্মরণ করিয়ে দাও, যে দিন সমূহে ওদের নেয়ামত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। নিশ্চয়ই এ দিন সমূহে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত– ৩৫ পারা– ১৩)

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك

অর্থাৎ– মরিয়মের পুত্র ঈসা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্য ভরপুর দস্তর খানা অবতীর্ণ কর। সেটা যেন আমাদের আগে পরের সকলের জন্য ঈদ হয় এবং তাহার পক্ষ থেকে স্মরণীয় নির্দশন হয়।

নিদর্শন সমূহ: (১) মসজিদে হারাম কাবাঘর (২) মসজিদে আকসা বায়তুল মুকাদ্দাস (৩) মসজিদে নব্বী শরীফ (৪) কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ (৫) সাফা-মারওয়া পাহাড় (৬) নবী, অলিদের আস্তানা মাজার শরীফ এবং তাদের বংশীয় সৎ চরিত্রের আওলাদ পাকগণ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। এ আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, হযরত মূসা (আঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়, যে বনী ইসরাইলকে নেয়ামত প্রাপ্তির তারিখসমূহ যেন স্মরণ করিয়ে দেন এবং যথাযথভাবে সেই দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করে। হযরত ঈসা (আঃ) অদৃশ্য থেকে খাদ্য ভর্তি দস্তর খানা আসার তারিখকে তাঁর আগে পরের সমস্ত ঈসায়ীদের জন্য ঈদ সাব্যস্ত করেছেন। তাই মীলাদ শরীফ বুজুর্গানে কিরামগণের ওরশ শরীফ, খোশরোজ শরীফ, আপন মাতা পিতার ফাতেহা শরীফ চল্লিশা ইত্যাদি সবই জায়েজ কেননা এগুলো আল্লাহ্র নেয়ামতের স্মরণ। আর এ স্মরণীয় দিন সমূহ পালন করা হলো কুরআনী নির্দেশ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– واذكروا نعمة الله عليكم অর্থাৎ– আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যেটা তোমাদের কাছে আছে। واما بنعمة ربك فحدث অর্থাৎ– আপনার প্রভুর নেয়ামতের খুবই চর্চা কর। (সূরা দোহা পারা– ৩০)

পবিত্র হাদীসের আলোকে খোশরোজ শরীফের বর্ণনা ঃ

عن قتادة رضى الله عنه سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علىّ (رواه مسلم ومشكوة المصابيح)

অর্থাৎ– হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বর্ননা করেন: নবী করিম (সাঃ) প্রতি সোমবারে কেন রোযা রাখেন– সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন– যেহেতু আমি সোমবারে জন্ম গ্রহন করেছি এবং সোমবারেই আমার উপর– কুরআনের প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হয়েছে' (মুসলিম শরীফ/মিশকাত শরীফ ১৭৯ পৃষ্ঠা) উপরোক্ত হাদীস শরীফ হোক আমরা বুঝতে পারি রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য সোমবার দিন অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন পালন করেছিলেন আমরা যাতে নবী করিম (সাঃ) ও তাঁর আওলাদ ও নায়েবে রাসূল আউলিয়ায়ে কেরামগণের জন্ম দিনকে পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করি। তাফসীরে সাভীতে পবিত্র কুরআনের সূরা দোহার শেষ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে–

والتحدث بالنعمة جائز لغيره ﷺ اذا قصد به الشكر وان يقتدى به غيره قال الحسن بن على رضى الله عنهما اذا عملت خيرا فحدّه به اخوانك ليقتدوا بك

অর্থাৎ– আয়াত খানার শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম বা বিধান সকলের জন্য আম। তাই আল্লাহ্র নেয়ামত প্রাপ্তি স্বীকার করে তার চর্চা করা নবী করিম (সাঃ) ছাড়া অন্যদের বেলায়ও জায়েয– যদি উদ্দেশ্য হয় শুকরিয়া আদায় করা এবং অন্যরাও যাতে তাকে অনুসরণ করতে পারে। হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন– "তুমি যদি কোন ভাল কাজ করো, তা অন্যকেও জানাও যাতে তারাও তোমার অনুসরণ করতে পারে এবং উক্ত ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে" (তাফসীরে সাভী চতুর্থ খন্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং খোশরোজ শরীফ এটা একটা ইবাদাত মূলক অনুষ্ঠান যেখানে কুরআন তেলাওয়াত, জিকির আজকার, মিলাদ-কিয়াম, ফাতেহা-তাবারুক বিতরনসহ অসংখ্য ধর্মীয় কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের কাছে ফয়েজ, রহমত, বরকত নিয়ে সমাগত হচ্ছে আগামী ১০ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর শেখে ফায়াল, জামালে মোস্তফা শানে জামালী ও শানে মাহবুবী ও মাশুকী সাহেবে বেলায়তে ওজমা বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রঃ) মহান খোশরোজ শরীফ। রাসূল করিম (সাঃ) এই ধরাধামে তশরীফ এনেছিলেন রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ। আর বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রঃ) ধরাধামে তশরীফ এনেছিলেন মহান রজব মাসের ১২ তারিখ। জন্ম তারিখের এই নিয়ম প্রমাণ করে শাহানশাহ্ বাবাজান রাসূল করিম (সাঃ)'র প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ও যোগ্য উত্তর সূরী যার আগমন পথহারা মানুষকে মুক্তির দিশা দেবার জন্য, মানুষের মনের মধ্যে স্রষ্টার প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য, ভক্ত কবির ভাষায়-

"এক নজর হেরে যারে, দিলের পর্দা যায় তার ছিঁড়ে,
মুর্দা কলব জিন্দা করে নূরের তজল্লায়"

মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন আমাদেরকে শাহানশাহ্ বাবাজানের নূরানী ফয়েজ দানে ধন্য করেন। আমীন।

আমার চেতনায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

• অধ্যাপক এ.ওয়াই.এম. জাফর •

আমার শৈশব ও কৈশোরে বাবাজান হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে দেখার সুযোগ হলেও আমার মনোজগতে তাঁর কোন প্রভাব পড়েছে বলে মনে পড়েনা। উপরন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও সে তাগাদা অনুভব করেছি বলেও তেমন মনে নেই। বরঞ্চ বিপরীত স্রোতে থাকতেই কেমন গর্ববোধ করতাম। সেভাবেই জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে, মওলা হুজুরের মামার বাড়ীর এক বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বদিন সকাল বেলা, তাঁদের বিশাল শান বাধানো ঘাটের পূর্ব দক্ষিণ পিলারে দাঁড়িয়ে দূরের দিগন্তজোড়া সবুজ প্রান্তর ছাপিয়ে জেগে উঠা টিলার গাছ গাছালির মাথায় ছড়ানো স্বর্ণালী আভা ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা শাহানশাহকে দেখতে দেখতে নিজের মধ্যে কেমন একটা বৈপরীত্য অনুভব করি। ১৯৭২/৭৩ সাল। বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজে তখন শিক্ষকতা করি। ততদিনে সবকিছু যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকে গ্রহণ বর্জন না করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। এ অবস্থায়, দীর্ঘ সময় বাবাজান একা দাঁড়িয়ে, কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস করছেননা। আমার ভেতরে কেমন একটা টান অনুভব করলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার ভেতরের যে বাসনা দীর্ঘদিন ধরে লালন করছিলাম, তা কেমন হবে তাঁর কাছে যদি জিজ্ঞেস করি? কিন্তু কী আশ্চর্য আমি একটু বলতেই তিনি সাথে সাথেই বললেন- "অসম্ভব ভালো হবে। আমার মা'ধু খুব ভালো, খুব ভালো হবে।" স্বভাবতই সেই থেকেই বাবাজানের আকর্ষণ আমার মাঝে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, অথচ তা হয়নি। আরো তিন বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আমার ভেতরের পরিবর্তনের জন্য। মূলতঃ সেই সময়টা কি বাবাজান আমাকে প্রস্তুতির জন্য দিয়েছিলেন? না হয় তিন বছর পর বাবাজানের বড় জামাতার বাসায় তাঁকে যখন আমাদের বাড়ি বাঁশখালী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি, তখন মনে হয়েছিল তিনি যেন দীর্ঘদিন ধরে আমার এ অনুরোধের অপেক্ষায় ছিলেন, সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন! বাবাজান দয়া করে যে আমাকে নিজের পরিচিতি জানান দিয়েছেন, সূর্যের ইশারায় চিনতে সাহায্য করেছেন সে আমি কী করে এতদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিলাম তা চিন্তা করতেও নিজেকে নিজের প্রতি ধিক্কার আসে, নিজেকে নিজের কাছে অপরিচিত মনে হয়। অথচ সেই প্রথম বার ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের বাড়ি তশরীফ রাখার পর কতবার যে বাবাজান দয়া করে এসেছেন এবং কখনো এসে বলেছেন- 'আপনার জন্য মন পুড়েছে বলেই আপনাকে দেখতে এসেছি'। এসেছেন কখনো একেলা কখনো মওলাহুজুর মা'জান বোন'রা সহ অন্য আত্মীয়দের নিয়ে। যতটুকু মনে পড়ে কখনো এসেছেন মরহুম আকমল খান সাহেবকে নিয়ে বা কখনো ফটিকছড়ির আব্বু চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে। অথবা কোনদিন এসেছেন আমি যখন টাউনে এ কে খান কোম্পানীতে চাকুরীরত তখন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী আলী নবী চৌধুরী ও আগ্রাবাদের হাজী ঈদ্রিস সাহেবসহ থেকেছেন প্রায় ৮/৯ দিন বা কখনো এসে গরু যবেহ করিয়ে মেজবান দিয়েছেন একেলা। এমনকি এসেছেন ওফাতের ২ সপ্তাহ পূর্বেও আমার বাসায় ১০/১২ জন ভক্ত নিয়ে রেখে এসেছেন টর্চ জ্বালিয়ে, বলে এসেছেন বাবাজানের রুবী' মাকে- "মাধু আমার অসুখ হবে তো, তাই আপনাদের দেখতে আসলাম- আমার ব্যবহৃত জিনিষগুলো হেফাজত করবেন।" মনে আসতেই চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে, চোখের পানি ধরে রাখা যায় না। নিজেকে বড় ছোট, বড় অপরাধী মনে হয়। কেন তাঁকে বুঝতে পারিনি চিন্তে পারিনি! আসলে কি তাঁকে বুঝতে, চিনতে চেষ্টা করেছি? মোটেই না, বুঝতে যদি চেষ্টাও করতাম তা হলেও হয়তো নিজের মধ্যে অন্তত কিছু উন্নতি লক্ষ্য করতাম। কিন্তু সব যে ফাঁকা। তেমন আমার মতো আরো অনেকে কী? না হয় বাবাজান বলবেন কেন, "সব যে পোক জোঁক, মানুষ কোথায়?" মানুষতো আশরাফুল মাখ্লুকাত বাবাজান তো আমাদের মাঝে আশরাফুল মাখ্লুকাতকে খুঁজেছেন। পাননি। তিনি তো আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে দেখতে চেয়েছেন গড়তে চেয়েছেন। এমনকি ওফাতের দিন সকাল নয়টার দিকে বন্দর হাসপাতালের গাড়ি বারান্দায় কক্সবাজার যাবার জন্য গাড়িতে উঠার প্রাক্কালে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন- "আপনি এখনো আছেন মামু সাহেব? এবার চলে যান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন।" কিন্তু বাবাজানের সে হুকুমইবা কতটুকু পালন করি? নামাজতো মেরাজুল

মোমেনীন। সে যোগ্যতা এ বয়সেও অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। বড় শঙ্কা বড় ভয়, শেষ পর্যন্ত বাবাজানের চাওয়া সে মানুষ হতে পারবোতো? যে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয়। মুনিবের সকল আশেক ভক্তদের আল্লাহ্‌ সে দয়া করুন। সেটাই বাবাজানের শেষ যাওয়া। আমার সাথে শেষ দেখা।

অসুখের সময় বন্দর হাসপাতালে ৩/৪ দিনই রাতে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল। শেষের দিন ভোর রাতে চলে যেতে চাচ্ছিলেন বলে আমি গ্রিলে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। আমাকে দিয়ে তালা খুলিয়ে বলেছিলেন "আমি যদি চলে যেতে চাই আমাকে কি ধরে রাখতে পারবেন?" আমার প্রতি বাবাজানের এতো দয়া - আমাকে তিনি রওজা শরীফের অভ্যন্তরে নেমে তাঁর শেষ শয়ানে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ওফাতের ১৮ ঘন্টা পরেও তাঁর শরীর গরম, কফিন ভেজা এবং রওজা শরীফের অভ্যন্তরে তাঁকে নামানোর সময় তিনি ওজনহীন ছিলেন। আমাদের নামানোর অসুবিধা হবে বলে কী? না হয় সোজা করার সময় ওজন অনুভব করলাম কীভাবে যা ইঞ্জিনিয়ার কামালুর রহমান ও মরহুম আকমল খান সাহেবও দেখেছেন অনুভব করেছেন সে সময় রওজা শরীফের অভ্যন্তরে তাঁরা ছিলেন বলে। জানিনা বিজ্ঞান এর কী ব্যাখ্যা দেবে!

যেমন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি ১৯৮৭ সালের হজ্বের সময় বাবাজান ৪ দিন একনাগাড়ে আমার বাহির সিগন্যালের বাসায় তশরীফরত অবস্থায় তাঁকে কীভাবে মক্কা শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় দেখলেন আহ্‌লা দরবার শরীফের আওলাদে পাক! তেমন ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি 'ভূগোলের গোল' খ্যাত কলামিস্ট, মেডিসিন, হাঁপানী ও এলার্জী বিশেজ্ঞ ডা. কিউ.এম. অহিদুল আলম তাঁর বাড়ির পাশের জমিতে অনেক ভক্তের সাথে শাহানশাহ্‌ বাবাজানের আসরের নামাজ আদায়ের কথা অথচ একই দিনে একই সময়ে দরবারের মসজিদেও তাঁর আসরের নামাজ আদায়ের ঘটনা। তাছাড়া বিশিষ্ট আশেক কালু ফকির যখন দেখেন গভীর রাতে বাবাজান একটা আপেল বার বার ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এবং তা আবার নিচে আসলে ধরে ধরে খেলছেন, কিন্তু কালু ফকির দেখার সাথে সাথে তা শূন্যে স্থির হয়ে যায় এবং বাবাজান বলেন- "আপেল খাবেন মামু সাহেব?" 'মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব' তখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অথবা বাবাজানের ওফাতের পর মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী ও তৎকালীন বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমসের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক হাসান শরীফ খান ও কর্মচারী গিয়াস উদ্দিনের চিন্তায় যখন আসে বন্দর হাসপাতালের সিঁড়ি যে রকম খাড়া লাশ মোবারক নামানোর সময় যদি কোন অসুবিধা হয়। কিন্তু তাদের চোখের ভ্রম নয়, দেখেন লাশ মোবারক নামানোর সময় বাবাজান কাপড়ের মধ্যেই হাত দুটো দিয়ে খাট শক্ত করে ধরে আছেন - এটাকেই বা বিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞায় ফেলা যাবে?

এই বাবাজানই আমাদের চিন্তা চেতনায় স্বপ্নে কল্পনায় বা নিত্য জাগরণে কতটুকু কার্যকর? তাঁর অনুরক্ত, ভক্ত বা আশেক হয়ে আমরা কোন পথে হাঁটছি বা মুনিবের দরবারে যে সমস্ত কার্যক্রম বা খেদমতের সাথে আমরা জড়িত তা কতটুকু আন্তরিকতা ঐকান্তিকতা এবং বিশ্বস্ততার সাথে পালন করছি? তিনি কি তার হিসাব রাখছেন বা দেখছেন? বা বর্তমান মুনিবের সমস্ত নির্দেশ উপদেশ আমাদেকে কী তাসির করছে। বেখোদ আমাদের - মুনিব দয়া করুন।

সংশোধনী

প্রিয় পাঠক গত সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় **"ইয়াহুদী হে নসারা হে হাকীকত মে বহী কমবখ্‌ত, জিসে গাউসে খোদা সে কুছ বদিল ইনকার হুজাবে"** শিরোনামের প্রবন্ধে ভূলবশতঃ একটি লাইন বাদ পড়ে যায়। তা হবে **(ক) বিলায়ত স্বীকার করে বিশেষ শানকে অস্বীকার করা, (খ) বিশেষ শানসহ বিলায়ত স্বীকার করে অধঃস্থ কাউকে সমকক্ষ মানা ইত্যাদি-ইত্যাদি।**

হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রঃ)'র জীবন ও কর্ম ঃ আধ্যাত্মিকতার আলোকে

• ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (র.)'র সান্নিধ্যে হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রঃ): বাদাউনে থাকাকালীন হযরত নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রঃ) হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ) (১১৭৫-১২৬৫) এর নাম শুনতে পান যাঁর অজোধোনে (Ajodhan) অবস্থিত 'জামাত খানা' মধ্যযুগীয় ভারতে আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। যেহেতু অজোধান (পরবর্তীতে পাকপত্তন (Pckpattan) হিসেবে পরিচিত) ছিল বিভিন্ন দিক থেকে আসা রাস্তাসমূহের সংযোগস্থল বা জংশন, সেহেতু সর্বস্তরের মানুষ (যথা: রাজা, বিশিষ্ট উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ, সেনাসদস্য, পন্ডিতব্যক্তি, বণিকদল প্রভৃতি) হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ) এর দরবারে আসতেন এবং তাঁর দোয়া নিতেন। নিম্নোক্ত দু'টো ঘটনা থেকে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ) এর জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাবে ঃ-

প্রথমতঃ তিনি যখন তাঁর মুর্শিদ হযরত শেখ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) এর ওফাতের পর দিল্লীতে আসেন, তখন দর্শনার্থী ও শুভার্থীদের ভিড়ে তিনি অবরুদ্ধ হয়ে যান। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ভক্তদের আকুতি শুনেন এবং তাদের বাসায় খাবারের জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁকে শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়ার জন্য খুব সকালে রওয়ানা হতে হয়, কেননা পথিমধ্যে ভক্তদের ভিড়ে যথাসময়ে মসজিদে যাওয়া কঠিন ঠিল। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই লোকজন দৌড়ে তাঁর কাছে আসত, তাঁর হাত মোবারক চুম্বন করত এবং তাঁকে ঘিরে ধরত। ফলে মসজিদে না পৌছা পর্যন্ত লোকদের আর্জি শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যেতেন।

দ্বিতীয়তঃ ১২৫১ সালের শাওয়াল সালে সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদ তাঁর সেনাবাহিনীকে উচ্ছ ও মুলতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে নির্দেশ দেন। পথিমধ্যে সৈন্যরা হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ) এর নিকট থেকে দোয়া নেবার জন্য তাঁর দরবারে যেতে মনস্থ করে। সৈন্যরা যখন অজোধানের শহরে আসল, তখন শহরের সকল রাস্তা ও বাজার অবরুদ্ধ (blocked) হয়ে গেল। সবাই চেষ্টা করতে লাগল বাবা ফরিদ (রঃ) এর দর্শন পাবার জন্য। বাবা ফরিদ (রঃ) এর জামার একটি টুকরা বা অংশ উন্মুক্ত রাস্তায় টাঙ্গিয়ে দেয়া হল। জনসমুদ্র জামার অংশটি স্পর্শ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। জামার অংশটি জনতার হাতের স্পর্শে খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল। বাবা ফরিদ (রঃ) অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁর মুরিদদেরকে তাঁর চতুপার্শে ঘিরে রাখতে বললেন যাতে জনতার ভিড়ে তিনি পিষ্ট হয়ে না যান।

বলাবাহুল্য, বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে বাবা ফরিদ (রঃ) এর আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের বিস্ময়কর ফলাফলই তাঁকে তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে এরূপ অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। হযরত শেখ নিজামউদ্দি (রঃ) এর বয়স যখন বার বৎসর তখন তিনি বাদাউনে থাকাকালীন সর্ব প্রথম হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ) এর নাম শুনেন। হযরত নিজাম উদ্দিন (রঃ) যখন শব্দ কোষ অধ্যয়ন করছিলেন, তখন আবু বকর খাররাত নামক একজন বাদ্যযন্ত্র বাদক তাঁর শিক্ষককে দেখতে আসেন এবং মুলতান ও অজোধানে তার সফরের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেন। জনাব আবু বকর খাররাত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার ধর্মীয় অনুরাগ ও ধ্যান সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং বলেন , তাঁর খানকাহ্ আধ্যাত্মিকতায় এত বেশী ভরপুর থাকে যে, এমনকি তাঁর চাকরাণীও ময়দা পিষতে পিষতে আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকে। অতঃপর লোকটি (আবু বকর খাররাত) হযরত শেখ ফরিদ গঞ্জে শকর (রঃ) এর খানকাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে থাকেন। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাঁর বর্ণনা শ্রবণ করেন এবং শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ)'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান। হযরত নিজাম উদ্দিন (রঃ)'র হৃদয়ে তাঁর (শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর) প্রতি এত প্রবল মহব্বত সৃষ্টি হয় যে, তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে অন্তত দশবার করে তাঁর নাম উচ্চারণ করে দোয়া করা বাধ্যতামূলকে নিয়মে পরিণত: করেন। হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) কে প্রতিনিয়ত স্মরণ করার মধ্যে হযরত নিজাম উদ্দিন (রঃ) অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার ঘ্রাণ অনুভব করেন। শৈশবকালে বাবা ফরিদ (রঃ)'র জন্য তাঁর অন্তরে যে ভালবাসা জাগ্রত হয় সে ভালবাসাই পরবর্তীকালে তাঁকে আধ্যাত্মিক সাফল্যের চরম শিখরে নিয়ে যায়। যখন শেখ নিজাম দিল্লীর পথে তাঁর আত্মীয় উজকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে

ডাকাত বা বন্য প্রাণীর ভয়ে ভীত হয়ে উজ্ বলতে থাকল, 'ওহে মুরশিদ! আমাদেরকে আল্লাহ্‌র হুকুমে রক্ষা করুন।' হযরত শেখ নিজাম (রঃ) তাঁর (উজ্ এর) পীর কে জানতে চাইলে উজ্ জানায় যে, তাঁর পীর হল শেখ ফরিদ (রঃ)। এর ফলে শেখ ফরিদ (রঃ)'র প্রতি হযরত শেখ নিজাম (রঃ)'র মহব্বত বা ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়।

ভাগ্যের কী অপূর্ব লিখন! হযরত শেখ নিজাম (রঃ) যখন দিল্লীতে আসলেন, তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁরই মহল্লায় শেখ নাজির উদ্দিন মোতাওয়াক্কিল নামক একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ দরবেশ বাস করেন যিনি দারিদ্র্যকে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ দরবেশ হলেন শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ)'র ছোট ভাই। জীবনের প্রথমভাগে একজন তুর্কী পদস্থ কর্মচারী একটি মসজিদ নির্মাণ করে তাঁকে তা তদারকির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর বসবাসের জন্য একটি বাড়ীও প্রদান করেন। এ তুর্কী কর্মকর্তার নাম হল ইৎমাত্। ইৎমাত্ তাঁর মেয়ের বিয়েতে আড়াই লাখ তংকা (তৎকালীন ভারতে প্রচলিত মুদ্রা) খরচ করেন অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে। শেখ নাজির উদ্দিন ইৎমাতের এ অপব্যয়ের সমালোচনা করেন। ফলে শেখ নাজির উদ্দিনকে ইৎমাত্ উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং পরিণামে তাঁকে অতিশয় দারিদ্র্য অবস্থায় কালাতিপাত করতে হয় জীবনের সত্তর বৎসর ধরে। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে একটি জীর্ণ কুটিরে তিনি দিল্লীতে জীবন অতিবাহিত করেন। এমনকি ঈদের দিনেও দর্শনার্থীদেরকে এক গ্লাস পানি ছাড়া আর কিছু খেতে দিতে পারতেন না। বিবি ফাতিমা শাম নামে একজন ধর্মপ্রাণ তাপসী মহিলা তাঁর ক্ষুধা ও উপবাসের যন্ত্রণা থেকে তাঁকে রেহাই দেয়ার জন্য সহায়তা করতেন। শেখ নাজির তাঁকে বোন বলে ডাকতেন, যে তাঁকে লুচি বানিয়ে খাওয়াত। এ মহান দরবেশ শেখ নাজির উদ্দিনের সান্নিধ্য লাভ করে হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) তাঁর জীবনকে আধ্যাত্মিক রঙ্গে রঞ্জিত করতে সমর্থ হন। হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) দিল্লীতে তাঁর শিক্ষা সমাপনান্তে কাজী পদে নিযুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু শেখ নাজির উদ্দিনের দোয়া প্রার্থনা করলেন। উল্লেখ্য, তৎকালে কাজী পদ প্রাপ্তিকে পন্ডিত ব্যক্তিরা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। শেখ নাজির উদ্দিন বললেন, 'কাজী হওয়া উচিৎ হবেনা। অন্য কিছু হবার জন্য চেষ্টা কর।' শেখ নাজির উদ্দিনের কথায় হযরত শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) হতাশ হলেও পরবর্তীকালে তাঁর সম্মুখে বহুমুখী আধ্যাত্মিকতার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় তিনি শেখ নাজিরের 'না' বলার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের তুলনায় দুনিয়াবী সাফল্য ও সরকারী চাকুরী অতি তুচ্ছ। সুতরাং শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) অজোধানে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর (রঃ)'র খানকাহ্ শরীফে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করলেন। তিনি অজোধানে যাবার জন্য হঠাৎ করে নাটকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন সময় একদা ভোর রাত্রে তিনি যখন দিল্লী জামে মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন তখন মুয়াজ্জিন পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আবৃত্তি করছিলেন যা' শেখ নিজামের অন্তরে খোদা প্রেমের ঝড় তোলে এবং মহব্বতের আগুন জ্বেলে দেয়। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কোন সহায়সম্বল জোগাড় না করে অনতি বিলম্বে অজোধান যাবার উদ্যোগ নিলেন। তাঁর অন্তরে যে আয়াতটি এরূপ জজ্‌বা সৃষ্টি করেছিল তা' নিম্নরূপঃ

বিশ্বাসীদের কলব (অন্তর) অতি বিনম্র
চিত্তে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকার
সময় কি আসে নাই?'(৫৭:১৬)।

শেখ নিজাম উদ্দিন যখন অজোধানে শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শকর(রঃ)'র জীর্ণ শীর্ণ কুটিরে পৌছলেন তখন দিনটি ছিল বুধবার এবং তাঁর বয়স হয়েছিল বিশ বৎসর। অন্যদিকে শেখ ফরিদ (রঃ)'র বয়স হয়েছিল প্রায় নব্বই বৎসর এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেখ নিজাম (রঃ) চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। শেখ ফরিদ (রঃ) তাঁকে নিম্নোক্ত বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করে অভ্যর্থনা জানালেনঃ

"তোমার বিচ্ছেদের আগুন অনেক অন্তর দগ্ধ করেছে।
তোমার সাথে মিলিত হবার উদগ্র বাসনা অনেক জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে।"

অনেক সাহসে ভর করে শেখ নিজাম উদ্দিন (রঃ) বললেন, । আমি আপনার (শেখ ফরিদ (রঃ)'র) চরণে চুমু দিতে চাই। অশীতিপর বৃদ্ধ দরবেশ শেখ নিজামের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'প্রত্যেক নবাগতই একটু চাঞ্চল্য বোধ করেন।' তিনি শেখ নিজামকে শান্ত হতে বললেন। তিনি শেখ নিজামের জন্য একটি খাটের ব্যবস্থা করতে তাঁর খানকাহ্‌র ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত একজন সিনিয়র শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন। হযরত নিজাম উদ্দিন দেখলেন যে, সকল সিনিয়র শিষ্য, ভক্ত ও দরবেশদের জন্য মাটিতে বিছানা পাতানো হয়েছে, অথচ তাঁকে খাটে শুতে বলা হচ্ছে। এতে তিনি একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। যখন মাওলানা

বদরুদ্দীন ইসহাক বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন তিনি শেখ নিজাম উদ্দিনকে নিম্নোক্তভাবে খবর পাঠালেন:
'তুমি কি তোমার গুরুর (শেখ ফরিদ) আদেশ মেনে চলবে?' শেখ নিজাম আর কোন উচ্চবাচ্য না করে খাটে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত শেখ ফরিদ (রঃ) সাধারণতঃ কাউকে বায়াত করানোর আগে তার মাথার চুল ফেলে দিতে বলতেন। কিন্তু শেখ নিজাম উদ্দিনের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটালেন। তিনি শেখ নিজামকে মাথার চুল রাখা অবস্থায় বায়াত করালেন। শেখ নিজামের চুল ছিল লম্বা এবং কোঁকড়ানো। এ ধরণের চুলের প্রতি শেখ নিজামের আকর্ষণ থাকতে পারে। তাই সম্ভবতঃ তাঁকে শেখ ফরিদ (রঃ) চুল ফেলতে বলেননি। কিন্তু শেখ নিজাম যখন দেখলেন যে, তাঁর সহপাঠি অন্যান্য শিষ্যরা মাথার চুল মুন্ডন করেছেন, তখন তিনি নিজেকে অপরাধি মনে করলেন এবং শেখ ফরিদ (রঃ)'র নিকট মাথা মুন্ডনের জন্য অনুমতি চাইলেন। শেখ ফরিদ (রঃ) তাঁকে নির্দ্বিধায় অনুমতি দিলেন। পরবর্তীকালে শেখ নিজাম তিন বৎসরে মোট তিনবার তাঁর মুর্শিদের কাছে গিয়েছিলেন এবং প্রতিবার কয়েকমাস যাবত তাঁর মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকেছিলেন। এভাবে শেখ নিজাম (রঃ) তাঁর মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাবা ফরিদ (রঃ)'র সাথে শেখ নিজাম (রঃ)'র অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। সব ঘটনা এখানে বিবৃত করা সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা না করলেই নয়। কারণ এ সকল ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেখ নিজাম (রঃ.)'র মনে দু'টো বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়– (১) তিনি কি লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন, নাকি ছেড়ে দেবেন? এবং (২) তিনি কি সম্পূর্ণরূপে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য একাগ্রচিত্তে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাধনা করবেন, নাকি লেখাপড়া বা ছাত্রত্ব বাদ দিয়ে কলবের সাধনায় মনোনিবেশ করবেন? বাবা ফরিদ (রঃ) তাঁকে বললেন, 'আমি' যখনও কাউকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বলিনা। একজন দরবেশের জন্য জ্ঞানার্জন অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং লেখাপড়া ও আধ্যাত্মিক সাধনা উভয়টি চালিয়ে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনা অধ্যয়ন বা লেখাপড়াকে অতিক্রম না করে।'

বাবা ফরিদ শেখ নিজাম উদ্দিনকে আধাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ মোকাম অর্জনের জন্য তাঁর (বাবা ফরিদের) ত্বরিকার কিছু মৌলিক নীতিমালা শিক্ষা দিলেন এবং তাঁর জীবনাচরণের দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণের জন্য উপদেশ দিলেন। দিল্লীতে থাকাকালীন শিক্ষাগত সনদ অর্জনের ফলে শেখ নিজামের অন্তরে যে গৌরবজনক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মাধ্যমে সুফিদের পরিশুদ্ধ আত্মা লাভ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন যাতে শেখ নিজাম মানবতার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, শেখ নিজাম বাবা ফরিদের উপদেশ গুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ফলে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সের যুবক শেখ নিজামকে বাবা ফরিদ তাঁর প্রধান খলিফা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। বাবা ফরিদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি একজন সুফি সাধকের যে সকল গুণাবলী অর্জন করেন। তার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ-

(১) শেখ নিজাম বাবা ফরিদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন মজিদের ছয় পারা, 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায় এবং আবু সাকুর সেলিমী কর্তৃক প্রণীত তামহিদাত আল মুহতাদী' গ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। কুরআন শরীফের বাকী পারাগুলো ও আওয়ারিফ উল মা 'আরিফ' গ্রন্থের বাকী অধ্যায়গুলো পড়াশুনার ভার শেখ নিজামের হাতে বাবা ফরিদ ছেড়ে দেন এবং শেখ নিজামকে একটি আধ্যাত্মিক যোগ্যতার সনদ প্রদান করেন।

বাবা ফরিদ মনে করেন যে, মানব হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রেরণা জাগ্রত করার জন্য পবিত্র কুরআন মজিদকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিৎ। বাবা ফরিদের খানকাহ্ (জামাত খানা) সর্বদা পবিত্র কুরআন আবৃত্তি কারকদের সুমধুর স্বরে মুখরিত থাকত। বাবা ফরিদের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে শেখ নিজাম সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ মুখস্ত করেন এবং দিল্লীতে নিজের খান্‌কাহ্‌তে কুরআন অধ্যয়নের রীতি চালু করেন। 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' গ্রন্থের লেখক শেখ শিহাব উদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী (রঃ) যাঁর প্রতি বাবা ফরিদ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই গ্রন্থটির বাস্তব ও ব্যবহারিক গুরুত্ব অত্যধিক। যাঁরা খানকাহ্ পরিচালনা করেন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থটি খুবই প্রয়োজন। যেদিন এ গ্রন্থটি বাবা ফরিদের হস্তগত হয়, সেদিনই বাবা ফরিদ (রঃ)'র একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বাবা ফরিদ সন্তানটির নাম রাখলেন শিহাব উদ্দিন। 'তামহিদাত' হল ইসলামী আইন বা ফেকাহ্ শাস্ত্রসম্বলিত পুস্তক। যে এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করবে, ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান অর্জিত হবে।

(২) কিভাবে বাবা ফরিদের চিন্তাপ্রসূত বুদ্ধিমত্তা (intuitive intelligence)' তাঁর শিষ্যের চরিত্রে সংক্রমিত হত তা' নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়। বাবা ফরিদ যখন হস্তলিখিত পান্ডুলিপি থেকে 'আওয়ারিফ উল মা'আরিফ' শিক্ষা দিতেন,

তখন খুব ধীরে ধীরে পড়াতেন কারণ পান্ডুলিপিটির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যে সকল ভুল ছিল তা' তিনি শুদ্ধ করে নিতেন। শেখ নিজাম পাঠদানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, শেখ নাজির উদ্দিন মোতাওয়াক্কিল এর নিকট একটি ভাল পান্ডুলিপি আছে যাতে ভুল নাই। বাবা ফরিদ বিরক্ত হলেন এবং বললেন, 'আমার মত দরবেশের কাছে ভুল পান্ডুলিপি সংশোধন করার কোন ক্ষমতা নাই? শেখ নিজাম যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মুর্শিদ তাঁর মন্তব্যে খুশী হননি, তখন তিনি বাবা ফরিদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর বেয়াদবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বাবা ফরিদের রাগ কমলনা। শেখ নিজাম দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি আত্মহত্যা করার চিন্তা করলেন। বাবা ফরিদের ছেলে শিহাব উদ্দিন শেখ নিজামের বন্ধু ছিলেন। তিনি শেখ নিজামের মানসিক অস্থিরতা দেখে বিষণ্ন হলেন, তিনি তাঁর বাবা শেখ ফরিদ (রঃ) কে শেখ নিজামের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং শেখ নিজামকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য রাজী করালেন। বাবা ফরিদ শেখ নিজামকে তাঁর (বাবা ফরিদের) সামনে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি এসব করেছি তোমার পূর্ণতা অর্জনের জন্য। একজন পীর হচ্ছে কনেদের সাজসজ্জাকারী (dresser of brides)। এ কথা বলে তিনি তাঁর বিশেষ পোষাকটি শেখ নিজামকে পরিয়ে দিলেন। শেখ নিজামের মন্তব্যটি মোটেও দোষের ছিলনা। কিন্তু বাবা ফরিদ এতে উত্তেজিত হয়ে দেখাতে চাইলেন যে, দিল্লীতে থাকাকালীন শেখ নিজাম যে বিদ্যা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁর কোন অহমিকা যেন তাঁর অন্তরে স্থান না পায়।

(৩) একদিন দিল্লী থাকাকালীন এক সহপাঠির সাথে অজোধানে শেখ নিজামের দেখা হয়। তিনি (সহপাঠি) একটি সরাইখানায় অবস্থান করছিলেন এবং তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য একজন ভৃত্যও তাঁর সাথে ছিল। শেখ নিজামকে জীর্ণশীর্ণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে বন্ধুটি আফসোস্ করে বললেন, মাওলানা নিজাম উদ্দিন! তোমার এ দুর্দশা কেন? তুমি যদি দিল্লীতে শিক্ষকতা করতে, তাহলে তুমি একজন বিখ্যাত পন্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে এবং তোমার আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হতো। শেখ নিজাম উত্তরে কিছু বললেন না, কিন্তু বাবা ফরিদকে বিষয়টি জানালেন। বাবা ফরিদ (রঃ) বললেন, "তোমার যদি সহপাঠির সাথে দেখা হয়, তাহলে তাঁকে নিম্নোক্ত কথাগুলো শুনিয়ে দেবেঃ-

তুমি আমার সফর সঙ্গী নও। তোমার পথে তুমি যাও। জীবনে সমৃদ্ধির অংশটা তোমার হোক এবং দুর্দশার অংশটা হোক আমার।"

অতঃপর বাবা ফরিদ (রঃ) শেখ নিজাম (রঃ) কে রান্নাঘর থেকে কিছু খাবার আনতে বললেন এবং মাথায় বহন করে তাঁর বন্ধুর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। বন্ধুটি বাবা ফরিদ (রঃ) কে দেখতে আসলেন এবং বাবা ফরিদের আধ্যাত্মিকতা চর্চার রীতি দেখে এত বেশী মুগ্ধ হলেন যে, তিনি বাবা ফরিদের ত্বরিকায় দীক্ষা নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

(৪) একদা একজন বৃদ্ধ লোক বাবা ফরিদের কাছে আসলেন এবং বললেন যে, শেখ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ)'র খানকাহ্তে বৃদ্ধলোকটির সাথে বাবা ফরিদের দেখা হয়েছিল। বৃদ্ধলোকটি তাঁর ছেলেটিকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন যে ছিল রগচটা, অসভ্য ও অমার্জিত। সে বাবা ফরিদের সাথে উগ্রভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করে এবং উচ্চস্বরে চীৎকার দিতে থাকে। শেখ নিজাম এবং বাবা ফরিদের ছেলে মাওলানা শিহাব উদ্দিন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন তাঁরা ছেলেটির রুক্ষ আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন মাওলানা শিহাব উদ্দিন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ছেলেটির গালে চড় মারলেন। ছেলেটি যখন মাওলানা শিহাব উদ্দিনকে পাল্টা চড় মারতে উদ্যত হল তখন শেখ নিজাম ছেলেটির হাত ধরে ফেললেন। বাবা ফরিদ তাঁর ছেলে মাওলানা শিহাব উদ্দিনকে দর্শনার্থীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। বাবা ফরিদের ছেলে বৃদ্ধলোকটি এবং তাঁর পুত্রকে কিছু কাপড় এবং টাকা দিলেন এবং উভয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে খুশিমনে বাবা ফরিদের খানকাহ্ থেকে প্রস্থান করল।

এ সকল ঘটনার মাধ্যমে বাবা ফরিদ শেখ নিজামকে আধ্যাত্মিকতায় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মাত্র। একজন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত না হয় এবং ইসলামী শরীয়াহ্ সম্পর্কে যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি না থাকে, তা'হলে সে ব্যক্তি কাউকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করতে পারেনা। দম্ভ ও অহংকারের কোন স্থান আধ্যাত্মিকতায় নেই। কোন ব্যক্তি খানকাহ্ থেকে অসন্তুষ্ট বা আঘাত পেয়ে যেন ফিরে না যায় সেদিকে একজন খানকাহ্ পরিচালনাকারী সূফি সাধককে খেয়াল রাখতে হবে।

(চলবে)

সত্যের আলোকধারা শাহানশাহ্ হযরত

• ড. মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন •

আজ থেকে পঁচাশি বছর পূর্বের কথা। ১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ মুতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার সুবহে সাদিকের সময় যখন লক্ষ লক্ষ মসজিদের মিনারায় মুয়াজ্জিনের সুমধুর কণ্ঠে ধ্বণিত হচ্ছিল পবিত্র আযানের ধ্বনি সে শুভ সময়ে এই ধরাধামে তশরিফ এনেছিলেন মাইজভাণ্ডার শরাফতের সমুজ্জল আলোকরশ্মি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.সি.আ:)। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে হযরতের আব্বা অসি-এ-গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সন্তানের নাম রাখেন 'জিয়াউল হক' অর্থাৎ 'সত্যের আলো'। স্বপ্নে ইশারা করে নামকরণের মাধ্যমে হযরত কেবলা সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার সত্যিকারের আলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে এই নবজাতকের মাধ্যমে। পরবর্তীতে জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে বিশ্বের হাজারো ঘটনা প্রবাহে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছিলেন তিনিই মাইজভাণ্ডারী তরিকার আলো, তিনিই জ্যোতি, তিনিই শাহানশাহ্ এবং তিনিই বিশ্বঅলি। সমস্ত বিশ্ব পরিমন্ডলের জন্য আল্লাহ্ যেমন রব তেমনি আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব (সাঃ) হলেন রহমত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র কুদরত এবং নবীজীর আজমত এর প্রকাশস্থল হলো সমস্ত গাউস, কুতুব, আবদাল এবং অলিআল্লাহ্গণের জ্যোতির্ময় হায়াতে জিন্দেগানী। বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর হায়াতের প্রতিটি অধ্যায় আল্লাহ্র কুদরতি নিশানা এবং নবীজীর নূরের আলোতে ভরপুর। যেমন- আমাদের প্রিয় নবী রহমতে আলম (সাঃ)'র এক উপাধি ছিল "ইমামুস সাক্বলাইন" অর্থাৎ জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের ইমাম, আর আমাদের শাহানশাহ্ ছিলেন "অলিউস্ সাক্বলাইন" অর্থাৎ জ্বিন ও ইন্সান উভয় সম্প্রদায়ের অলি। তাই মাইজভাণ্ডার শরীফের বাড়ীতে তথা হুজরায় অবস্থান কালীন অনেক সময় তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন। ভক্তরা কৌতুহলী হয়ে উঠতেন। একবার বেশকিছু সময় - অদৃশ্য থাকার পর যখন বিছানায় হঠাৎ দৃশ্যমান হলেন, তখন এক আশেক জিজ্ঞেস করলেন 'মামা এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন?

হযরত জবাব দিলেন, "জ্বি, জ্বিনের দেশে দুই দল জ্বীনের মাঝে মারামারি, খুনোখুনি হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা সে ঘটনার বিচারের ভার আমার উপর অর্পন করেন, আমি বিচার করতে গিয়েছিলাম। আমার বিচারে উভয় পক্ষ খুশী হয়েছে এবং আমাকে বহু মূল্যবান মণি, মুক্তা, হিরা, জহরত উপহার দিয়েছে। উপহারগুলো আমি গ্রহণ না করে তাদেরকে বললাম ঘুষ নেয়া যেমন বিচারকের জন্য জঘন্য অপরাধ তেমনি উপহার নেয়াও ঘুষের নামান্তর। সুতরাং তোমাদের হিরা মুক্তা তোমরা ফেরত নিয়ে যাও। এতক্ষণ "আমি মাইজভাণ্ডার শরিফ ছিলাম না তাই আপনি বিছানায় বা ঘরে দেখতে পাননি।"[১]

সত্যিই তিনি ছিলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার এক উজ্জ্বল আলোকধারা। তিনি নিজেই তার অমিয় বাণীতে ইরশাদ করেছিলেন, মাইজভাণ্ডার শরীফে একটা মোমবাতি জ্বলছে; সে মোমবাতির আলোয় সব জায়গা আলোকিত। সে বাতির আলোয় মানুষেরা পোকার মত উড়ে উড়ে পড়ছে।"[২] হযরত নিজেই নিজকে মোমবাতির সাথে তুলনা করেছেন। যা সদা দীপ্তিমান। মোমবাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যা অপরকে আলো দেবার জন্য নিজগুণে জ্বলতে থাকে এবং জ্বলতে জ্বলতে এক পর্যায়ে হাকীকতের মাঝে নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। মূলতঃ শাহানশাহ্ হযরত বিশ্ব মানবতার হৃদয়ে নূরের প্রদীপ জ্বালাবার জন্য নিজের সর্বময় জীবন আল্লাহ্র মাঝে, রসূলে পাক (সাঃ) এর পাক চরণে এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কদমে বিলীন করে দিয়ে ফানার সব মকাম অতিক্রম করে তিনি আজ বাকাবিল্লাহ্। আল্লাহ্তে যাঁরা ফানা হয়ে যান আল্লাহ্র সে কুদরতি নিশানা বিশ্ববাসীকে দেখাবার জন্য ইন্তিকালের পরেও তাঁরা বাকা (অবশিষ্ট) থেকে যান।

যারা সত্যিকারের অলিআল্লাহ্ তারা শুধু নির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক নন তারা বিশ্ব নাগরিক। বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখায় জন্ম নিলেও তাঁদের বেলায়তের ক্ষমতা বিশ্বজুড়ে, তাইতো শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কালাম করেছিলেন, "রহমতুল্লিল আলামীন রাসূলের রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মক্ষমতা।" যেমন কালাম তেমন কাজ, বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গাউসিয়া হক মন্জিলকে আন্তর্জাতিক আধ্যাত্মিক প্রশাসনের সদর দপ্তর

বানিয়ে কিভাবে তিনি বিশ্বব্যাপী তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

তিনি ননতো কোন চিহ্নিত সীমানার
তিনি এ দেশের তিনি সে দেশের
তিনি সারা বিশ্বের।

কখনো তিনি ভক্ত আশেকদের কাছে আজমীর শরীফে খাজা গরীবে নেওয়াজ এর দরবারে উদ্ভাসিত হয়েছেন, কখনো দেখা গিয়েছে মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহ্‌র পাদদেশে, আবার কখনো এখানে বসে ইরান, ইসরাইল-লেবনান যুদ্ধ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছেন। এসব কিছু হযরতের বেলায়তী কর্মক্ষমতা।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেছেন, বান্দা অতিরিক্ত নফল ইবাদাত তথা রিয়াজতের মাধ্যমে আমার এমন নৈকট্যপ্রাপ্ত হল বান্দার চোখ তখন আমার কুদরতি চোখ হয়ে যায় সে আমার কুদরতি চোখ দিয়ে দেখে বান্দার কান আমার কুদরতি কান হয়ে যায় সে আমার কুদরতি কান দিয়ে শুনে, বান্দার পা তখন আমার কুদরতি পা হয়ে যায় বান্দা আমার পা দিয়ে চলে, বান্দার হাত তখন আমার কুদরতি হাত হয়ে যায় সে আমার হাত দিয়ে ধরে, সাধক যখন সাধনার এ পর্যায়ে নিজকে উপনীত করেন তখন তিনি হয়ে যান আল্লাহ্‌র কুদরত প্রকাশের নূরের খনি। অসি-এ-গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কত চমৎকার বলেছেন-

'আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি,
সকল আঁধার দূর হয়ে যায় মানুষ হয় অন্তর্যামী।'[৩]

মূলতঃ রিয়াজতের পরম সে সোপানে নিজকে উপনীত করে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) নিজেই পরিণত হয়েছিলেন আলোর খনিতে। যাঁর আলোতে আজ দুনিয়া আলোকিত, যাঁর খুশবুতে আজ দুনিয়া মাতওয়ারা। সত্যিই তিনিই 'জিয়াউল হক'। সত্যিই তিনি সত্যের আলোকধারা।

তথ্যসূত্রঃ-

১। শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)
- জামাল আহমদ সিকদার, দশম সংস্করণ-২০১২ পৃঃ ৩৪৫।
২। প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা ১০০।
৩। এলাকার রেনেঁসা যুগের একটি দিক
- সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

সূফি উদ্ধৃতি

■ যারা দুনিয়াকে শুধু একটি আমানতের মালের মত মনে করেন, তারা প্রয়োজন কালে অনায়াসে ইহা আমানতের মালিকের হাতে সোপর্দ করে চলে যেতে পারেন। তাদের মনে কোনরূপ দুঃখ অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

■ যে পার্থিব গৃহকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ভগ্নস্তূপের উপর পারলৌকিক সৌধ রচনা করে, আর পার্থিব মোহাবিষ্ট হয়ে পারলৌকিক সৌধ ভেঙ্গে তার উপর পার্থিব প্রাসাদ রচনায় নিয়োজিত হয় না, মূলতঃ সে লোকই হল প্রকৃত বুদ্ধিমান।

–হযরত হাসান বসরী (রাহ্)

■ যার আয়ু শুধু রূহ ও আত্মার উপর নির্ভরশীল, রূহ বা আত্মার বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তার আয়ু শেষ হয়– সে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু যার আয়ু বা জীবন আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভরশীল, তার কখনও মৃত্যু ঘটে না বরং সে অপ্রকৃত যিন্দেগী থেকে প্রকৃত যিন্দেগী অর্জন করে মাত্র।

–হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ্)

■ আমি কখনও দুনিয়াদারের কাছে বসা পছন্দ করি না এবং তাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করা ভালবাসি না।

■ সন্দেহজনক বস্তু থেকে পরহেজ করা ও অন্তরকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখাই পরহেজগারী।

–হযরত বিশর হাফী (রাহ্)

স্মৃতিচারণ : শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক (রহঃ) কে যেমন দেখেছি

• মোঃ সিরাজুল ইসলাম •

পটভূমিকাঃ

মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত বিবি হাওয়া (আঃ) থেকে। মহান আল্লাহ্ মানব ও দানবকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর মনোনীতদের কাছে মহাগ্রন্থাবলীর সওগাত দিয়ে পথহারা অন্ধকারে নিমজ্জিতদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষ নবী সায়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে।

নবীদের আগমন বন্ধ হলেও জাতির কাণ্ডারী হিসেবে তাঁর আদর্শের উত্তরসূরী আলেম সম্প্রদায়। জ্ঞানী-গুণী, অলি, গাউস, কুতুব, মুজাদ্দেদ, পীর-মুর্শিদ যুগ যুগ ধরে নবীদের উত্তরাধিকার হিসেবে পথহারা ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিতদের সঠিক, নির্ভুলভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পথ প্রদর্শন করছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিবেদিত প্রাণ, আধ্যাত্মিকতা ও খুলুসিয়াত দিয়ে জাতির দিশারী হিসেবে কাজ করছেন। বাংলাদেশ ওলামা, পীর আওলিয়া, গাউস-কুতুব ও সূফিদের জন্মস্থান। অপরদিকে চট্টগ্রামকে ইসলামাবাদও বলা হয়। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অবদান অপরিসীম।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহঃ):

স্মৃতিপটে ভেসে আসে সেই ছাত্রজীবনের অনেক কর্মকাণ্ড। দেখে আসা ঘটনাবলী যা খুব বেশি স্মরণে পড়ে এবং বার বার মনে উঁকি দেয়। সেই অলি গাউস ও পীর-মাশায়েখদের সংশ্রব ও সাক্ষাতের কাহিনী। তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইহলোকে নেই। মনে পড়ে সেই ১৯৮৫ সনের কথা, যখন আমি ছাত্র। সহপাঠি বন্ধুদের নিয়ে বের হলাম অলিদের মাযার যিয়ারত ও জীবিত অলিদের সাক্ষাতের। তারই অংশ হিসেবে আমরা রওয়ানা হলাম ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার শরীফে। উদ্দেশ্য হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী ও হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী-এর মাযার জিয়ারত। সাথে আশা ছিল তৎকালীন গদিনশীন অলিকুল মিলোমনি হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করা। আমরা চার বন্ধু মিলে মাযারগুলো যিয়ারতের পর হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। ভিতরে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য দরজার দিকে যেতে না যেতে দেখি উনি বের হচ্ছেন, পরনে ছিল সাদা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, ধবধবে সাদা দাড়ি, নূরানী চেহারা। উনাকে দেখে আমি অনেকক্ষণ উনার চেহারা মোবারকের দিকে চেয়ে থাকলাম, কদমবুচি করলাম। তাঁর সাথে এটিই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে আমাদের সাথে কথা বললেন এবং কুশলাদি বিনিময় হল। উনার সেই আলোকিত উজ্জ্বল চেহারা, নূরানী অবয়ব, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ, আনুগত্যের স্পৃহা জাগল। পরবর্তীতে আমার পক্ষ হতে তাঁর দৃশ্যমান অবস্থার বর্ণনা বিভিন্ন সময় বিভিন্নস্থানে আমি প্রকাশ ও প্রচার করি। এরপর আরো কয়েকবার মাইজভাণ্ডার শরিফ গিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় আর দেখা পাইনি। এর পরবর্তীতে তিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে পাড়ি দিয়েছেন।

তাঁর অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুরাগী, মুরিদান ও ভক্তদের রেখে চিরশায়িত সেই চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির মাইজভাণ্ডার গ্রামে। যার মাযার যিয়ারতে শত শত লোকের দৈনিক সমাগম। তাঁর জারি করা জ্ঞান, বিদ্যা ও তরিকতের সবকের চর্চা অব্যাহত আছে। তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) সেই আলোকবর্তিকা নিয়ে দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। যার মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে অনন্য অবদান রাখছেন। তাঁর কর্ম কালজয়ী আদর্শ হওয়া থাকবে। তাঁর এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ মহান রাব্বুল আলামিন কবুল করুন।

এতবড় মহান ব্যক্তিও অলিদের কথা লিখে শেষ করার মত সে দুঃসাহস আমার নেই। তারপরও সেইদিনের সাক্ষাতে 'দেখে আসা স্মৃতিগুলো' উপস্থান করতে চেষ্টা করেছি।

এ লেখায় উৎসাহদাতা প্রফেসর আবদুল্লাহ্-আল-মাহমুদ। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে মহান অলির সাগরতুল্য গুণাবলি থেকে একটি ক্ষুদ্রাংশ রেখার বদৌলতে আমার ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির ওসিলা হয়, এই কামনা করি। (আমিন) "ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ"।

মাইজভাণ্ডার শরিফকে ঘিরে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় নিবেদিত জনাব জামাল আহমদ সিকদারের স্মৃতিচারণ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে মাইজভাণ্ডার শরিফের বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের প্রচ্ছন্ন হাত ও আধ্যাত্মিক কর্মধারা ক্রিয়াশীল ছিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু মাইজভাণ্ডার শরীফের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বহু আগেই স্বাধীন বাংলাদেশের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

জনাব জামাল আহমদ সিকদার। বয়স এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে প্রায় ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে সুন্দরপুর ইউনিয়নের ছোট ছিলোনিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। সার্বক্ষণিকভাবে এখন থাকেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে। গাউসিয়া হক মনজিলের সার্বিক দেখাশোনা, দরবারের ভক্ত জনতার সাথে সময় দেওয়া এবং মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাংগঠনিক পথ নির্দেশনা প্রদানসহ দরবার ও শাহানশাহ্ হুযুরকে ঘিরে বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ তথা বই পুস্তক রচনায় এখন সময় অতিবাহিত করছেন জনাব জামাল আহমদ সিকদর। জ্ঞান-বুদ্ধি বিচক্ষণতায় অনন্য যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী জামাল আহমদ সিকদার সাহেব হলেন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হক সৌভাগ্যবান মানুষ। সারা জীবন তিনি দরবার নিয়ে পড়ে আছেন। মাইজভাণ্ডার শরীফের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং দরবারের বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের যশ-কীর্তি তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি লেখনীর মাধ্যমে বিরল অবদান রাখেন। দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে অসীম খাটুনি খেটে একজন ইতিহাসবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শাহানশাহ্ হুযুরের (কঃ) জীবন দর্শন ও জীবন-মহিমার ওপর লেখা তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ **'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।'** এ গ্রন্থ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৫ এপ্রিল ২০১২ সন পর্যন্ত গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত সহজ সরল বর্ণনায় যাতে উঠে আসে শাহানশাহ্ হুযুরের (কঃ) অলৌকিক-আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের নানা বিস্ময়পূর্ণ ঘটনা-তথ্য মাসিক আলোকধারার পক্ষে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মঙ্গলবার জামাল আহমদ সিকদারের মুখোমুখি হন সংবাদকর্মী **আ.ব.ম. খোরশিদ আলম খান**। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) মাদ্রাসার তৃতীয় তলায় তাঁর সাথে আলাপকালে ছিলেন আলোকধারার মুহম্মদ আশরাফুজ্জামান আশরাফ ও মুহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন। জামাল আহমদ সিকদারের কাছ থেকে শোনা নানা স্মৃতি কথা আলোকধারার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলোঃ

■ মাইজভাণ্ডার শরীফে প্রথম গমনঃ ১০/১২ বছর বয়সে ৩য় শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ১০ মাঘ গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) বার্ষিক ওরশ শরিফে বাড়ির এক চাচাকে নিয়ে সর্বপ্রথম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গমন করেন জনাব জামাল আহমদ সিকদার এরপর থেকে ছাত্র অবস্থায় বহুবার তিনি দরবার শরিফে আসেন। মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলের সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হুযুরের বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হযরত সৈয়দ নূরুল বখতেয়ারের সঙ্গে পরিচয়ের পর ১৯৬৭ সনে আবারও মাইজভাণ্ডার শরিফে যান সিকদার সাহেব। অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) আতিথ্য গ্রহণ করে গোশ্ত তরকারি দিয়ে খাবার খেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হলেন জনাব জামাল আহমদ সিকদার। দরবারে গিয়ে এই প্রথম অন্য রকম ভালো লাগে তাঁর। তিনি অসিয়ে গাউসুল আযমের কাছে বাইয়াত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার সাহেবের মাধ্যমে হুযুর সমীপে বাইয়াত গ্রহণের আগ্রহের কথা জানানো হলে হুযুর তাঁকে বললেন, এখন নয়- বাইয়াতের জন্য কিছু শর্ত পালন করতে হয়। ৪টি শর্ত পূরণে সক্ষম হলে আরো পরে অন্য এক সময় সিকদার সাহেবকে বাইয়াত করা হবে বলে আশ্বস্ত করলেন অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বাইয়াতের জন্য ৪টি পূর্বশর্ত হিসেবে তাঁকে বলা হলো, মিথ্যা ত্যাগ করা, পরনিন্দা বর্জন করা, হালাল জীবিকা তালাশ করা এবং নামাজ-রোজায় অভ্যস্ত হওয়া। এ চারটি শর্ত জুড়ে দিয়ে দিয়ে বাইয়াতের জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতির সময় দেওয়ার পর ১৯৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সিকদার সাহেবকে বাইয়াত করালেন অসিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। হুযুরের মুখে মুখে কলেমা তৈয়বা, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সালসহ নানা দোয়া-দরূদ পড়ে মাইজভাণ্ডারী তরিকার দীক্ষা নেন সিকদার সাহেব। এর পর থেকেই অন্য রকম আধ্যাত্মিক আবহে সিকদার সাহেবের জীবন বদলে যেতে থাকে। নিজের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে মাইজভাণ্ডার শরিফ ও মাইজভাণ্ডারী মহাত্মাগণ।

■অসিয়ে গাউসুল আযমের সান্নিধ্যে বিরূপ মনোভাব পাল্টে যায়ঃ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ মাহবুবে সোবহানির ছেলে সৈয়দ মুহাম্মদ খোরশেদ ছিল সিকদার সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দরবারের লোক হলেও মাহবুবে সোবহানি ও তাঁর ছেলে খোরশেদ হযরত অসিয়ে গাউসুল আজমকে

ও তাঁর ছেলে খোরশেদ হযরত অসিয়ে গাউসুল আজমকে সুনজরে দেখতেন না। বরং নানা কটূক্তি ও বদনাম করতেন ওই পরিবারের লোকেরা। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সঙ্গে এই পরিবারের মামলা সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে অসিয়ে গাউসুল আযম দুনিয়াদার-মানুষের প্রতি জুলুম করে - ইত্যাদি কথা বলতেও দ্বিধা করতো না সৈয়দ খোরশেদ গংরা। বন্ধু খোরশেদের মুখে নানা বিরূপ মন্তব্য ও অভিযোগ শুনে আসা সিকদার সাহেব মনে মনে সংকল্প করলেন তিনি দরবার শরিফে গিয়ে অসিয়ে গাউসুল আজমের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করবেন। ঠিক এই সময়ে দরবারের খাস লোক হযরত সৈয়দ নূরুল বখতিয়ারের সাথে পরিচয়ের পর ১৯৬৭ সনে মাইজভাণ্ডার শরিফে গেলেন সিকদার সাহেব। ছাত্রজীবন থেকেই যদিও তাঁর দরবারে যাওয়া-আসা – কিন্তু এবারের যাত্রা ভিন্ন উদ্দেশ্য, ভিন্ন চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে। অসিয়ে গাউসুল আযমকে কাছ থেকে দেখা, তাঁর আচার-আচরণ পরখ করা এবং তিনি দুনিয়াদার নাকি দুনিয়াবিমুখ আল্লাহ্‌র ওলী তা ভালোভাবে উপলব্ধি করাই জামাল আহমদ সিকদারের এবারের দরবারে গমনের মূল লক্ষ্য। মাইজভাণ্ডার শরিফে হযরত সৈয়দ নূরুল বখতিয়ার সাহেবের উপস্থিতিতে সিকদার সাহেব সাক্ষাত করলেন অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) সঙ্গে। হুযুর খানাপিনার ব্যবস্থা করলেন। সেদিনের খানাপিনা ও তরকারির খুব স্বাদ লেগেছে বলে জানান সিকদার সাহেব। হুযুরের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন তিনি। হুযুর তাঁকে বললেন, 'যতো প্রশ্ন আছে বলুন। জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।' সেদিনের প্রথমবারের মতো হুযুরের সঙ্গে আলাপ মনের মধ্যে যতো থাক দ্বিধানন্দ ছিল তা দূর হয় বলে জানান সিকদার সাহেব। এমন একজন কামেল বুযুর্গ মানুষের প্রতি অযথা বিদ্বেষ-বিরূপ মন্তব্য করে আসা সৈয়দ মাহবুবে সোবহানি ও সৈয়দ খোরশেদের দুরভিসন্ধিমূলক আচরণের রহস্য বুঝতে পারলেন সিকদার সাহেব। একজন দ্বীনদার আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তিত্বকে 'দুনিয়াদার' ও 'জুলুমবাজ' আখ্যায়িত করা যে নিছক শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই নয় তা সিকদার সাহেব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন। অসিয়ে গাউসুল আযমের সাথে প্রথম সাক্ষাত ও কথাবার্তায় তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাবোধ জন্মালো সিকদার সাহেবের। এভাবেই দরবার শরিফ ও এর মহাত্মা বুজুর্গকে পরীক্ষা ও পরখ করে নেওয়া হলো তাঁর। নিন্দুকের সমালোচনা ও বদনাম শুনে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সম্পর্কে যে কারো মনে বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হতেই পারে। এক্ষেত্রে সবার উচিত, দরবারে যাওয়া এবং দরবারের বুযুর্গদের জীবনাচার কাছ থেকে দেখা। দরবার শরিফ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলা এবং নিন্দুকের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস পোষন করে দরবার সম্পর্কে অমূলক ধারণা পোষণ করা কখনো বিবেকবান ও সত্য নিষ্ঠ মানুষের কাজ হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন মাইজভাণ্ডার শরিফকে কষ্টি পাথরে যাচাই করা প্রবীণ ব্যক্তিত্ব জনাব জামাল আহমদ সিকদার।

■ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে দোয়া করেছিলেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তি সংগ্রামে সাফল্যের জন্য মাইজভাণ্ডার শরিফের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বিশেষভাবে দোয়া ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৫২ সনেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন অসিয়ে গাউসুল আযম। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, এক সময়ের তুখোড় আওয়ামী লীগ নেতা জামাল আহমদ সিকদার আলাপে জানালেন, মাইজভাণ্ডারী মহাত্মাদের করুণাধারাই মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয়ের পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান ও জাতির দিশারী হিসেবে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার শরিফের মহাত্মাদের আধ্যাত্মিক সুদৃষ্টি ক্রিয়াশীল ছিল। জামাল আহমদ সিকদার ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত পেশ করে বলেন, ১৯৫২ সন থেকে বহুবার মাইজভাণ্ডার শরিফ জেয়ারতে আসেন বঙ্গবন্ধু। গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র উত্তরাধিকারী তথা অসিয়ে গাউসুল আজম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কাছ থেকে শুনেছি, ১৯৫২ সনে প্রথমবারের মতো সপরিবারে মাইজভাণ্ডার শরিফে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রওজা শরিফ জেয়ারত সেরে হুজরায় অসিয়ে গাউসুল আযমের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গবন্ধু আবেদন জানান– 'মামা! আমাকে দোয়া করুন যেন বাঙালি জাতিকে পশ্চিমাদের শোষণের কবল থেকে মুক্তি করতে পারি।' কীভাবে মুক্তি সম্ভব' অসিয়ে গাউসুল আযমের এ জিজ্ঞাসার জবাবে বঙ্গবন্ধু দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন 'আন্দোলন করবো, এটাই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার হাতিয়ার।' হুযুর আবার প্রশ্ন করেন 'যদি ব্যর্থ হন'– তখন হাতে ছুরি নিয়ে আঘাত করার ভঙ্গি দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু উত্তর দেন 'তাহলে এভাবে অর্থাৎ অস্ত্র ধরে।' কালজয়ী দিব্য দৃষ্টিতে দেখে মহান আধ্যাত্ম পুরুষ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বলেন– 'এ পথেই আসবে বাঙালি জাতির মুক্তি।' অতঃপর হুযুর ডান হাত তুলে সম্মতির ভঙ্গিতে বললেন– 'আমি আপনাকে দোয়া করলাম।'

বাংলাদেশ যে একদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেবে, বাঙালি জাতি যে পশ্চিমা পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের বিজয় ছিনিয়ে আনবে– তা ১৯৫২ সনেই সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। আল্লাহ্‌র ওলীদের ইশারা ও

দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বড় ধরনের বিজয় সূচিত হতে পারে এবং বড় সাফল্য ধরা দিতে পারে তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই হয় বঙ্গবন্ধু মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সফর ও আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশনা লাভ– বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের বড় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে পরিচিহ্নিত ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে জানালেন গবেষক-সংগঠক জনাব জামাল আহমদ সিকদার।

■ বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফায় হযরত সৈয়দ দেলাওর মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র দিক নির্দেশনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিবিড় যোগাযোগ ছিল। হুযুর কেবলা (কঃ) বঙ্গবন্ধুকে কেবল স্নেহের চোখে দেখতেন না, নানা প্রতিকূল মুহূর্তে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুকে উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে ধন্য করেন বহুবার। মুক্তিযুদ্ধের বহু আগে থেকেই অসিয়ে গাউসুল আযমের (কঃ) রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও আধ্যাত্মিক দিব্য দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা যায় নানা মন্তব্য দিক নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্ন ভূমিকায়। কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক দিশারী নন, রাজনৈতিক ও জাগতিক ব্যাপারে ও অসিয়ে গাউসুল আযমের (কঃ) নির্ভুল পথ নির্দেশনা ও ভবিষ্যৎ বাণী ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ– একথা জোর দিয়ে বলা যায়। বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে প্রণোদিত ও প্রভাবিত করেন। এই বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। স্মৃতিচারণে এসব তথ্য পেশ করেন সংগঠন জামাল আহমদ সিকদার [১৯৫৮ সনে দ্বিতীয় দফায় বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফে আসেন এবং অসিয়ে গাউসুল আযমের (কঃ) কাছ থেকে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন উল্লেখ করে আলাপে জামাল আহমদ সিকদার বলেন, জেনারেল আয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের কিছু দিন পর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তারেক আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য এন জি মাহমুদ কামাল, আগ্রাবাদের সাবেক কমিশনার ফজলুল হক, চট্টগ্রাম মহানগরীর পাথরঘাটা রাজা মিয়া সওদাগরের নাতি এম এ গণি এবং ডবলমুরিং হতে নির্বাচিত প্রাক্তন এম পি জনাব মোহম্মদ ইসহাক চেয়ারম্যানসহ তার জিপযোগে বঙ্গবন্ধু আরো কয়েকবার মাইজভাণ্ডার শরিফ গমন করেন। এসময় বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামীলীগ নেতারা খাদেমুল ফোকারা অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের জন্য, দেশ ও মানুষের জন্য তাঁর দোয়া কামনা করেন। হুযুর কেবলা (কঃ) বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ও কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)-এর রওজা শরিফ জেয়ারত করে বিশেষভাবে দোয়া করেন। অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য হুজরা শরিফে বসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঁচটি মূলনীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। তা হলোঃ (১) প্রশাসনিক, সামরিক, বিচার বিভাগসহ সকল সরকারি অফিস আদালতে বাঙালির ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ। (২) আঞ্চলিক শোষণ-জুলুম অবসানের জন্য কার্যকরী অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুঁজে বের করা। (৩) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাহেতু জনগণের জানমালের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (৪) এসব ন্যায্য দাবির পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য দেশের সর্বত্র সুষ্ঠু-মজবুত সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা। (৫) প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমতাভিত্তিক ন্যায্য সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

বলাবাহুল্য, ১৯৫৮ সনে বঙ্গবন্ধু মাইজভাণ্ডার শরিফে এসে অসিয়ে গাউসুল আযম (কঃ) কর্তৃক উক্ত যে দিক নির্দেশনা লাভ করেন- পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৬ সনের ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পেশ করেন ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত এই ৬ দফা দিন ১৯৫৮ সনে হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) নির্দেশিত নীতিমালারই অংশ বিশেষ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনেও নানা রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির মোড় পরিবর্তনে এবং দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রগতি ও প্রত্যাশা বাস্তব রূপ লাভ করার ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের আধ্যাত্মিক করুণা ও দরবারের বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের অনুগ্রহ ছায়া ক্রিয়াশীল বলে সুদৃঢ় বিশ্বাস জনাব জামাল আহমদ সিকদারের 'মাইজভাণ্ডারী করুণাধারাঃ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি' শীর্ষক সাড়া জাগানো এক নিবন্ধে সিকদার সাহেব উক্ত বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছেন। **'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ' নামে গবেষক সাংবাদিক-কলামিস্ট জনাব মোঃ মাহবুব উল আলমের** প্রকাশিত গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। চট্টগ্রামের 'বলাকা প্রকাশন' থেকে ২০০৯ সনে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ পাঠে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে। সিকদার সাহেবের সাক্ষাৎকার গ্রন্থনার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ জন্যে ঋণ স্বীকার করা হচ্ছে।

[জামাল আহমদ সিকদারের সাক্ষাৎকারের শেষ কিস্তি ইনশাআল্লাহ্ প্রকাশিত হবে আলোকধারা জানুয়ারী ২০১৪ পরবর্তী সংখ্যায়]

আত্তাওজিহাতুল্ বহিয়্যাহ্ বা সিজ্দাহ্ তাহিয়্যার সুপ্রমাণ পুঞ্জ

মূল:
কালজয়ী ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, গাউসে যমান, কুত্বে দওরান, ইমাম আ'যমে যমান, শায়খুল ইসলাম, আল্লামা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কু.)

• অনুবাদ: এস এম জাফর ছাদেক আল্ আহাদী •

[দ্বীনি আচারের বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে আলেম ও বিদ্বজ্জনদের গবেষণার অন্ত নেই, তেমনি ভাষ্যেরও শেষ নেই। সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত চেতনার আলোকে ইতিহাসের ঘটনাবলীর মতো ধর্ম-দর্শন-আচার সম্পর্কেও নব নব ব্যাখ্যা ও ভাষ্য উৎসারিত হয়। এগুলো গবেষণা ও আয়াসলব্ধ ফসল বিধায় আগ্রহী হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আকর্ষণ করে। 'সিজদা'-ও তেমন একটি বিষয়, যা আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, কবি, ভক্ত-আশেকরা নিজ নিজ উপলব্ধি ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সিজদার আক্ষরিক, তাত্ত্বিক, মরমী, বৈজ্ঞানিক ও শারীরবিদ্যাগত দিক নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে আল্লামা মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ)-এর 'আত্তাওজিহাতুল বহিয়্যাহ্' সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল আলোচিত একটা গ্রন্থ, যা একদা মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেম ও যুক্তিবাদী শিক্ষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং প্রশংসাও পেয়েছিল। এই সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের জিগীষা ও কৌতূহলের দাবী (Academic Interest) মিটানোর প্রয়াসে এই গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হচ্ছে।]

পূর্বপ্রকাশিতের পর: প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তা'আলার বাণী–

ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

(তোমরা মুসলমান হলে পরে কি, তোমাদেরকে কুফরী করার নির্দেশ দিবেন?) আয়াতটি সিজদায়ে তাহিয়্যাহ্ কুফরী হওয়ার দিক নির্দেশনা দেয় না। কেননা তা'তে দৃষ্টি দিলে পরে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্তা'আলা, ফেরেশ্তাগণ ও নবীগণকে রব বা প্রভু সাব্যস্ত করতেই নিষেধ করেছেন। যেমন তাহাই সাক্ষ্য দেয়, উক্ত আয়াতস্থ আল্লাহ্তা'আলার বাণী–

ولا تتخذوا الملائكة والنبين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون

অর্থাৎঃ "তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিবেন না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে রব বা প্রভু সাব্যস্ত করে নেবে! তোমরা মুসলমান হলে পরে কি তোমাদেরকে কুফরী করার নির্দেশ দিবেন?" অতএব তথায় কুফরী দ্বারা ফিরিশতাগণ এবং নবী গণকে রব তথা প্রভু সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য; সিজদাহ্ তাহিয়্যাহ্ উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি উক্ত দাবীদার তাহাই উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছেন।

পক্ষান্তরে নবী করীম (দঃ) সাহাবাগণ কর্তৃক সিজদাহ্ করার আকাংখা ব্যক্ত করলে তৎ নিষেধাজ্ঞায় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ বলে কথিত মতটি মেনে নিলেও কিন্তু আয়াতটির মর্মে গভীর চিন্তা করলে পরে বুঝা যায় যে, উক্ত সিজদাহ্ তাহিয়্যাহ্মূলক সিজদাহ্ ছিলনা। নচেৎ তথায় 'কুফর' শব্দ আরোপ করতেন না। আর সিজদায়ে তাহিয়্যাহ্ যে, কারো মতেই কুফরী নয় তা বিদিত। বরং সেক্ষেত্রে এমন অর্থবোধক সিজদাহ্ই ছিল, যদ্বারা নবী করিম (দঃ)কে রব বা প্রভু সাব্যস্ত করার আপত্তি ধার্তব্য হয়। তৎপক্ষে দলিল স্বয়ং আল্লাহ্তা'আলার বাণী–

ولايامركم ان تتخذوا الملائكة والنبين اربابا

অর্থাৎঃ ফিরিশতাগণ এবং নবীগণকে রব সাব্যস্ত করার এমন নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিবেন না (সূরা আলে ইমরান)। আরো দলিল যে, ইহুদী খ্রীষ্টানের অন্তর্ভূক্ত কাফিরগণ জিব্ত ও তাগুতের (প্রতিমা ও দেবদেবীর) ইবাদত করে চলছিল এবং তাদের পন্ডিত গুরু (আহ্বার) ও পাদ্রীদেরকে (রাহ্বারকে) 'রব' সাব্যস্ত করতঃ রবুবিয়্যাতের বা প্রভুত্বের যথাযোগ্য সিজদাহ করে চলছিল। আল্লাহ্তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে–

الم ترا الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت

অর্থাৎঃ আপনি কি (আসমানী) কিতাবের এমন অংশীদারগণের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা জিব্ত এবং তাগুতের (প্রতিমা ও দেবদেবী কিংবা দেবতা ও শয়তানের) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে? (সূরা নিসা)। ইরশাদ হচ্ছে–

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم

অর্থাৎ ঃ তারা (ইহুদী-খ্রীষ্টানগণ) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত গুরুদের ও পাদ্রীরকে এবং মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে (ঈসা আলাইহিস্সালামকে) 'রব' (খোদা-প্রভু) সাব্যস্ত করে নিয়েছে (সূরা তওবা)। ইরশাদ হচ্ছে–

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم

অর্থাৎ ঃ ওরা নিশ্চয় কুফরী করেছে, যারা বলে, আল্লাহ্ হচ্ছেন মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মরিয়মই (সূরা মায়িদা)। ইরশাদ হচ্ছে–

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثة

ওরা নিঃসন্দেহে কাফির, যারা বলে– নিশ্চয় আল্লাহ্ হচ্ছেন তিন খোদার মধ্য থেকে তৃতীয় (সূরা মায়িদা)।

ইরশাদ হচ্ছে–

قالت اليهود عزيرابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله' ذالك قولهم بافواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل' قاتلهم الله انّى يؤفكون

অর্থাৎ: ইহুদীগণ বলল, 'ওযাইর আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রীষ্টানগণ বলল, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র; ওই সব কথা তাদেরই মুখের যা পূর্ববর্তী কাফিরদের কথার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ; আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুক, তারা যে, কোথায় উল্টে পড়ছে! (সূরা তওবা)।

অতএব নুসূস্ বা দলিল সমূহের অর্থপূর্ণ সাক্ষ্য যে, তারা তাদের পন্ডিত গুরুদের ও পাদ্রীদেরকে 'রব' বা প্রভু সাব্যস্ত করতেছিল এবং তাদের জন্য রবুবিয়্যাতের তথা প্রভুত্বের সিজদাই করে চলছিল। [১] তা দেখেই কতেক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সমীপে তাঁকে সিজদাহ্ করার আকাংখা নিবেদন করেন। যেমন কায়েস ইবনে সা'দ (রাঃ) হাদিস তাই স্পষ্ট করে দেয়–

قال اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت لرسول الله ﷺ احق ان يسجد له فاتيت رسول الله فقلت الى اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت احق الىٰ يسجدلك فقال لى ارايت لومررت بقبرى اكنت تسجدله' فقلت لا' فقال لا تفعل لو كنت آمر احدا انيسجد لاحد لامرت النساء ان يسجد لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق (مشكوة عن ابى داود)

অর্থাৎ ঃ তিনি বলেন, আমি হীরায় গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তারা তাদের সমাজপতিদেরকে সিজদাহ্ করছে। এতে আমি বললাম, তার চেয়ে রাসুলাল্লাহ (দঃ) নিকট এসে বললাম, আমি হীরায় গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তারা তাদের সমাজপতিদেরকে সিজদাহ্ করছে। অতএব তার চেয়ে আপনাকে সিজদাহ্ করা যাওয়াই অধিক উপযোগী। এতে নবী করিম (দঃ) আমাকে বললেন, তোমার মত কি, তুমি আমার কবরের নিকট গেলে কবরকে সিজদাহ্ করতে? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি (দঃ) বললেন, তা করো না; আমি যদি কারো জন্য সিজদাহ্ করার নির্দেশ কাউকে দিতাম, তাহলে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীকে সিজদাহ করে। কারণ, আল্লাহ্তা'আলা স্বামীদের অধিকার তাদের উপর রেখেছেন (মিশকাত, আবু দাউদ হতে)।

এ হাদিসটি বরং সিজদার বাধাদানে অবতারিত অনুরূপ হাদিসসমূহ দূর্বল শ্রেণীরই হাদিস। দুর্বল হবার এক প্রমাণ এই যে, সেগুলো মিশকাতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে এবং ওই পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদিসসমূহ দূর্বলই। আর হাদিসের দূর্বলতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করলেও নবী করিম (দঃ) স্বয়ং নিজের জন্য সিজদাহ্ করতে হযরত কায়েস বিন সা'দ (রাঃ)কে নিষেধ করার কারণ জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্নদের নিকট গোপন নয়। কারণ এই যে, হযরত কায়েস (রাঃ) খ্রীষ্টানদেরকে তাদের সমাজপতিদের জন্য সিজদাহ্ করতে দেখে (রাঃ) সমীপে তাঁকে সিজদাহ্ করার আকাংখা নিবেদন করেন; অথচ তিনি ছিলেন ইসলামে নতুন। তাই নবী করিম (দঃ) আশংকা করলেন যে, সিজদার অনুমতি দিলে তাঁকে প্রভু সাব্যস্ত করার এবং প্রভুত্বের সিজদাহ্ করার পুরাপুরি সম্ভাবনা রয়েছে; যেমনটি ইহুদী-খ্রীষ্টানগণ তাদের পন্ডিত গুরুদের ও পাদ্রীদেরকে প্রভু সাব্যস্ত করতঃ উক্ত সিজদাই করে। এজন্যই তিনি (দঃ) তাঁকে বললেন–

ارايت لومررت بقبرى اكنت تسجد له

অর্থাৎঃ তোমার মত কি, তুমি আমার কবরে (রওযা শরীফে) গমন করলে কবরকে সিজদাহ্ করতে?" যার অর্থ দাঁড়ায়–

لوتريد ان تسجدلى كما يسجدون لاحبارهم ورهبانهم فهم يتخذونهم اربابا ويسجدونهم بسجود الربوبية حتى يسجدون لقبورهم ايضا زعمامنهم انهم ارباب لهم فهل انت ترى ان تجعلنى ربا وتسجد قبرى فقال لاارى ذالك فقال النبى ﷺ ان كان الامر كما قلت فلا تفعل كما يفعلون

অর্থাৎ ঃ "তারা তাদের পন্ডিত গুরুদের ও পাদ্রীদেরকে যেমন সিজদাহ করে তেমনি সিজদাহ যদি তুমি আমাকে করতে চাও, তাহলে তারাতো ওদেরকে প্রভু বানিয়ে প্রভুত্বেরই সিজদাহ্ করে; এমনকি নিশ্চয় তারা তাদের প্রভু বলে ধারণা প্রসূত তাদের কবরকে ও সিজদাহ্ করতে চাইবে? তিনি বললেন, আমি তা চাইব না। অতঃপর নবী করিম (দঃ) বললেন, তুমি যেমন বললে ব্যাপার যদি তাহাই হয়, তবে ওরা যেমন। যা' করছে তা তুমি করো না।" এখানে নবী করিম (দঃ) তাঁকে সর্বাঙ্গীন কাজটি থেকেই নিষেধ করলেন; সিজদাটির নিজস্বতা থেকে নিষেধ নয়। এতেকরে খ্রীষ্টানগণ স্বীয় পাদ্রীদের সম্মানের ক্ষেত্রে, তাদেরকে প্রভু সাব্যস্ত করা এবং ঐ আক্বীদা সহকারে সিজদাহ্ করা সংক্রান্ত যে সব কাজ করে থাকে সে সবের নিষেধাজ্ঞাই সাব্যস্ত হয়। এতদ্বারা হাদীসস্থ لاتفعل (তুমি তা করো না) অর্থ হচ্ছে–

لاتجعلنى ربا ولا تسجدلى فى حياتى وبعد مماتى فى قبرى كما يجعلون رهبانهم اربابا ويسجدون لهم فى حياتهم وبعد مماتهم فى قبورهم

অর্থাৎঃ "তুমি আমাকে প্রভু সাব্যস্ত করো না এবং আমার জীবদ্দশায় আমাকে আর ইন্তিকালের পর আমার কবরে ঐরূপ সিজদাহ করো না, যেমনটি তারা তাদের পাদ্রীদেরকে প্রভু বানিয়ে জীবদ্দশায় তাদেরকে এবং মৃত্যুর পর তাদের কবরে সিজদাহ করে।" এতএব নিষেধাজ্ঞাটি এ হেন শর্তবদ্ধকরণ

অভিমুখিই, শুধুমাত্র সিজদাহ্‌টির নির্দিষ্টতা মুখী নয়।
এতদ্বারা জানা যায় যে, হযরত কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাঙ্ক্ষিত সিজদাহ্ আলাদা করে তাহিয়্যার জন্য ছিলনা; নচেৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁকে لومررت بقبری اکنت تسجدله (অর্থাৎ তুমি কি আমার কবরের নিকট গমন করলে কবরকে সিজদাহ্ করবে?) উক্তি থেকে শুরু করে হাদিসটির শেষাবধি ইরশাদ করতেন না। অথচ কবরের জন্য তাহিয়্যার সিজদাহ্ হওয়ার কোন অর্থ নেই [২]। এতদ সত্ত্বেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে তা বলার দরুন বুঝা যায়, কাঙ্ক্ষিত সিজদাহ্‌টি সম্মানের উদ্দেশ্যে হলেও তাতে এমন অর্থ রয়েছে, যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে প্রভু সাব্যস্ত করণের দিকে ধাবিত করবে। অবস্থা এমন যে, তখনকার যুগে সৃষ্টিকে প্রভু সাব্যস্ত করে সিজদাহ করার প্রথা চালুই ছিল। যেমন- খ্রীষ্টানদের কর্তৃক পাদ্রীদেরকে প্রভুত্বের সিজদাহ্ করা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যা। তাইতো তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁকে বললেন- لاتفعل ای لاتسجدلی کما تسجد النصاری للرهبان "তুমি করো না; অর্থাৎ খ্রীস্টানগণ তাদের পাদ্রীদেরকে যেমন সিজদাহ্ করে, তেমনি সিজদাহ তুমি আমাকে করো না।"

টীকাঃ প্রসঙ্গ কথাঃ [১] (প্রভুত্বের সিজদাই করে চলছিল) ঃ যেহেতু খ্রীষ্টানদের আক্বীদা হল, পূর্ণসাধনার ফলে তাদের পাদ্রীদের সত্তার স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তার স্তর 'লাহুত' আগমন করে বিধায় তারা তাদের প্রভু। অতএব তারা উক্ত আক্বীদা যোগেই তাদেরকে সিজদাহ্ করে। আর ইহুদীগণ ধারণা করে যে, বস্তুসমূহ বা বিষয়াবলী তাদের পন্ডিতগুরুদের হালাল করণে হালাল এবং হারাম করণে হারাম হয়; সেক্ষেত্রে তারা তাদেরকে প্রভুই ধারণা করত ঃ অনুগত হয় এবং সে আক্বীদা বিশ্বাস যোগেই সিজদাহ করে। এতদ্বারা আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী- ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون (তোমরা মুসলমান হলে পরে তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন?) আয়াতের অর্থ হবে
یا یها المسلمون ایامرکم ان تعتقدوا فی حق النبی کما تعتقد الیهود والنصاری فی حق الاحبار والرهبان حتی تسجدون له سجود الربوبیة کما یسجدونهم بذالک السجوج
অর্থাৎঃ হে মুসলমানগণ! ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা তাদের পন্ডিতগুরু ও পাদ্রীদের বেলায় যে'মত আক্বীদা রাখে, তোমরা তোমাদের নবীর বেলায় সে'মত আক্বীদা রাখতে এবং তারা যেমন তাদেরকে প্রভুত্বের সিজদাহ্ করে সে'মত সিজদাহ্ তোমরাও তাঁকে করতে কি তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিবেন?" আর আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী- لایتخذ بعضنا بعضا اربابا (আমাদের মধ্যে কেউ যাতে আল্লাহ্ ভিন্ন পরস্পরকে প্রভু সাব্যস্ত করে না নিই) আয়াতটি উক্ত অর্থের স্পষ্ট উপাত্ত। অতএব আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী- ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون এবং তাঁরই বাণী- لایتخذ بعضنا بعضا اربابا আয়াত দু'টি দ্বারা সিজদাহ্ তাহিয়্যাহ্ মনসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে বলে ফেনীর মোনাযারায় উত্থাপিত দাবীর বাতিলতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ উক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা 'ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রদত্ত সিজদার নির্দেশ বিধান' রহিত হওয়ার কথা কোন তাফসীর কারকই বলেননি। বরং উক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা 'ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রদত্ত সিজদার নির্দেশ বিধান' রহিত হওয়ার কথা কোন তাফসীর কারকই বলেননি। বরং উক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা তা রহিত হওয়ায় কোন অর্থই যে হয় না, সে বিবরণ গ্রন্থকারের বর্ণনার অচিরেই আসতেছে (ওবাইদুন আকবর)

প্রসঙ্গ কথাঃ [২] (কোন অর্থ নেই) এখানে নবী করিম (দঃ) সিজদাহ্ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে সেক্ষেত্রে কবরে সিজদাহ্ করার প্রসঙ্গ টানার হেতু কি তা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। সুস্পষ্ট যে, তৎকালীন ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত সিজদাহ্, তাহিয়্যাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্ ভিন্ন কাউকে তথা তাদের গুরুত্ব পাদ্রী প্রর্মুখকে প্রভু সাব্যস্ত করতঃ তাদের সাক্ষাতে এবং কবরে প্রভুত্বের মর্যাদা সম্পন্ন সিজদাহ্ করে চলছিল। তাদের কর্তৃক উক্ত রূপ প্রভু সাব্যস্ত করার জ্বলন্ত প্রমাণ যে কুরআনে করীমে রয়েছে, তা ইতিপূর্বে আমাদের মহামান্য গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন; তৎসঙ্গে আলোচ্য হযরত কায়েস (রাদ্বিঃ) হাদিসটি মর্মেও তা প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু তাদের কর্তৃক কবরকে প্রতিমা বানিয়ে ইবাদতের সিজদাহ্ করার প্রতিকূলেই (রাদ্বিঃ) প্রার্থনা করেন- اللهم لاتجعل قبری وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد

অর্থাৎঃ "আল্লাহ্! আমার মাযারকে মূর্তিতে পরিণত করতে না দেয়া হোক, আল্লাহ্‌তা'আলার 'লানত' তাদের উপর যারা নিজেদের নবীগণের কবর সমূহকে (ইবাদতের সিজদার) মসজিদই সাব্যস্ত করে ফেলল।"
অথচ হযরত কায়েস (রাদ্বিঃ) তাদের উক্তরূপ সিজদাহ্ প্রথার অংশ বিশেষ দেখেই রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে সিজদাহ্ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন। এমতাবস্থায় উক্তরূপ প্রচলিত প্রথা দৃষ্টে কাঙ্ক্ষিত সিজদাহ্ করার অনুমতি দিলে, একই প্রকারের সিজদাহ্‌ই অনুমোদিত হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় বিধায় নবী করিম (দঃ) এ সিজদা করতে, নিষেধ করলেন। এতে আল্লাহ্ ভিন্নের জন্য প্রভুত্বের তথা ইবাদতের সিজদাহ্ করাই নিষেধ বুঝায়, তাহিয়্যাহ্‌মূলক সিজদার নিষেধাজ্ঞা নয়।
পক্ষান্তরে রাসুলাল্লাহ্ (দঃ) রওযায়ে পুরনূর যিয়ারত কালে রওযা শরীফের উদ্দেশ্য নয়, বরং রওযা শরীফস্থ মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সালাতুস্‌সালাম সহ যথার্থ সম্মানযোগে তাহিয়্যাহ্ নিবেদন অর্থবহ বিধায় সেরূপ ক্ষেত্র বিশেষে তাহিয়্যাহ্ মূলক সিজদাহ্ অর্থবহ। [অনুবাদক]

(চলবে)

মাজার শরিফে ফুল দেয়া, গিলাফ চড়ানো, বাতি জ্বালানো, গোলাপ জল ছিটানো প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান

• আলহাজ্ব মুফ্তী বাকীবিল্লাহ্ আযহারী •

আল্লাহ্তা'য়ালার ওলীগণ ও তাঁদের মাজার শরিফ সমূহ আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন বা ধর্মের নিশানা। যেমন আল্লাহ্তা'য়ালা মক্কা শরিফে খানা-এ-কা'বার পাশে সাফা ও মারওয়া দুটি পাথরের পাহাড়কে তাঁর নিদর্শন বলে পবিত্র কুরআনে সূরা বাক্বারা শরিফে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে:

ان الصفا والمروة من شعائر الله অর্থাৎ: নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়। আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শনসমূহ হতে দুটি নিদর্শন। (সূরা বাক্বারা ১০৮)

তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফের ১ম খণ্ড ২৬২ পৃ: এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন-

(ان الصفا) علم لجبل بمكة وسمى الصفا لانه جلس عليه ادم صفى الله (والمروة) علم بجبل فى ايضا وسمى المزوة لانها جلست عليها امرأة ادم حواء عليهما السلام۔

অর্থাৎ- সাফা পাহাড়কে 'সাফা' নামকরণ করা হয়েছে কারণ এর উপর হযরত আদম সফীউল্লাহ্ আলাইহিস্ সালাম বসেছিলেন এবং মারওয়া পাহাড়ের নাম মারওয়া রাখা হয়েছে কারণ আদম আলাইহিস্সালাম এর বিবি হযরত হাওয়া আলাইহিস্ সালাম বসেছিলেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খণ্ড ২৬২পৃ:)

হযরত খাজা মুহাম্মদ হাছর জান সেরহিন্দী মোজাদ্দেদী (রহঃ) আল উসুলুল আরবা কিতাবের ১০পৃ: উল্লেখ করেন:

علامت را گویند پس ہر کہ دیدن ان ضابط ایمان از شعائر الله است تعظیم کعبہ حق اولیاء الله شعائر الله است

অর্থাৎ- "যাকে বা যে স্থানকে দেখলে অন্তরে খোদাভীতি জাগে ও খোদার স্মরণ হয় সেগুলোই আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন। নবীগণ আলাইহিমুস্সালাম, কা'বা শরিফ, এমন কি আউলিয়া আল্লাহ্গণও খোদার নিদর্শন।"

হানাফী মাজহাবের বিশ্ববিখ্যাত আব্বাঈদ ও ফিকাহ্র কিতাব (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা) ১ম খণ্ডের ১৭৯পৃ: উল্লেখ আছেঃ

شعائر الله اربعة وهى القران والكعبة والنبى ﷺ والصلواة

অর্থাৎ- আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হলো চারটি। (ক) কুরআন শরিফ, (খ) কা'বা শরিফ (গ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘ) সালাত বা নামাজ।

কালামুল্লাহ্ বা আল্লাহ্তা'য়ালার কথা হিসেবে কুরআন যেমন নিদর্শন, বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্তা'য়ালার ঘর হিসেবে কা'বা যেমন নিদর্শন, হাবিবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্তা'য়ালার খাস বন্ধু হিসেবে নবী করিম (সাঃ) যেমন- নিদর্শন, তেমনি ওলী আল্লাহ্ বা আল্লাহ্তা'য়ালার বন্ধু হিসেবে ওলী আল্লাহ্গণও আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা শরিফ হতে একজন প্রকৃত মুমিনে কামেল ওলী আল্লাহ্ আরো অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যা বিশ্ব বিখ্যাত 'সিহাহ্ সিত্তার' অন্যতম ৬টি কিতাবের মধ্যে একটি কিতাব "তিরমিযী শরিফ" এর ২য় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় বাবু তা'জিমুল মু'মেন" নামক অধ্যায়ে হাদীস শরিফে উল্লেখ রয়েছে।

আর আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন সমূহ তথা ধর্মের নিশানা সমূহকে তা'জিম বা সম্মান করার জন্য পবিত্র কুরআন শরিফের বহুস্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা হজ্বের ৩২নং আয়াতে আল্লাহ্তা'য়ালা ইরশাদ করেন: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের সম্মান প্রর্দশন করবে নিশ্চয়ই এর দ্বারা তার ক্বলবে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি সঞ্চার হবে। সূরা হজ্বের ৩০নং আয়াতে আল্লাহ্তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্তা'য়ালার সম্মানিত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তবে তার জন্য ইহা তার প্রতিপালকের নিকট উত্তম। সূরা মায়েদার ২নং আয়াতে আল্লাহ্তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ يايها الذين امنوا لا تحل شعائر الله ولا شهر الحرام

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্তা'য়ালার নিদর্শন সমূহের অসম্মান করিও না এবং সম্মানিত মাস সমূহেরও না।

আল্লাহ্তা'য়ালার বাণী (শায়ায়ের) ইহা (শাইরাতুন) এর বহুবচন। আরবী ভাষায় বচন তিনটি (এক বচন) (দ্বিবচন) (বহুবচন)। আরবী ভাষায় বহুবচন হলো নিম্নে তিন উপরে অসংখ্য। আর (শায়ায়ের) জমা বা বহুবচন এর সিগা ব্যবহার করেছেন। বহুবচন ব্যবহারের দ্বারা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্তা'য়ালার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। আর প্রত্যেক নিদর্শনের সম্মান করার নির্দেশ আল্লাহ্তা'য়ালা নিজেই দিয়েছেন।

সূরা ইউনুস শরিফের ৬২নং আয়াতে আল্লাহ্তা'য়ালা ওলী আল্লাহ্গণের শান ও মান আমাদের সম্মুখে এভাবে তুলে ধরেছেন: الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون অর্থাৎ- সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ্তা'য়ালার ওলীগণের (দুনিয়া ও আখিরাতে) কোন প্রকার ভয়-ভীতি নেই ও চিন্তা-পেরেশানীও নেই।

আল্লাহ্তা'য়ালা তাঁর নিদর্শন সমূহের সম্মান করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার শর্তারোপ করেননি। এক এক দেশে এক এক ধরণের সম্মানের রীতি প্রচলিত আছে। যেই দেশে যেই ধরণের বৈধ তা'জীম প্রচলিত আছে সেই মতে করা জায়েজ। আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাজার শরিফের উপরে ফুল অর্পণ করা, চাদর চড়ানো এবং মাজারের পাশে বাতি জালানো, গোলাপ জল ছিটানো ইত্যাদি হলো সম্মান প্রর্দশন তাই এগুলো জায়েজ। তাজা, কাঁচা ফুলের যেহেতু এক প্রকারের জীবন আছে, সেহেতু এটা তাসবীহ্ তাহলীল করে। যার ফলে- মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পেয়ে থাকে অথবা তার শাস্তি হ্রাস পায় এবং যিয়ারতকারীগণ এর থেকে সুঘ্রাণ লাভ করে তাই এটা প্রত্যেক মুসলমানের

কবরে অর্পণ করা জায়েজ। আর ওলীআল্লাহ্গণের মাজার শরিফে ফুল অর্পণ করে তা'জিম শ্রদ্ধা, সম্মান প্রকাশ করা হয়।

মাজার শরিফে ফুল অর্পণ করা

বহু হাদীস শরিফ দ্বারা এবং ইসলামী শরীয়তের গ্রহণযোগ্য মু'তাবর বিশ্ববিখ্যাত ফত্ওয়ার কিতাবাদীতে মাজার শরিফে বা কবরে ফুল অর্পন করা জায়েজ বলে ফত্ওয়া প্রদান করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু দলিল পেশ করা হলো।

বিশ্ববিখ্যাত বুখারী শরিফ ১ম খন্ড ১৮২পৃ: আল জারীদু আলাল কবর অধ্যায়ে এবং বিশ্ববিখ্যাত মিশকাত শরিফ ৩০পৃ: বাবু আদাবিল খোরা অধ্যায়ে বর্ণিত আছে:

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال مر النبى ﷺ بقبرى فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفى رواية فى لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة قالوا يارسول الله ﷺ لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا (متفق عليه)

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিঃ) বর্ণনা করেন- একবার হুজুর নবী করিম (সাঃ) দু'কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেন, মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের কবরে আযাব হচ্ছে। বড় কোন কারণে আযাব হচ্ছে না বরং এদের মধ্যে একজন পেশাব করার সময় প্রস্রাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকতো না এবং অপরজন পরনিন্দা করতো। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগ করে দু'কবরে গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) আপনি এরকম কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন: যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাঁচা ডাল না শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের আযাব কম হবে। (বোখারী ও মুসলীম শরিফ)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী শাফেয়ে রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেনঃ

وقيل انهما يسبحان مادام رطبتين واستحب العلماء قرأة القران عند القبر لمهد الحديث اذ تلاوت القران اولى بالتخفيف من تسبيح الجريد

অর্থাৎ- যতক্ষণ ডাল কাঁচা থাকবে ততক্ষণ তাসবীহ্ পাঠ করবে। এ জন্য কবরের পার্শ্বে কুরআন শরিফ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা কবরের আযাব কমানোর বেলায় ডালের তাসবীহ্ থেকে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক বেশী।

বিশ্ববিখ্যাত মিশকাত শরিফের শরাহ্ "আশিয়াতুল লুমআত" গ্রন্থে শায়খুল মাশায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী (রঃ) এ হাদীসের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেন-

تمسک کنند جماعت باین حدیث در اندختن سبزه وگل ریحان بر قبور

অর্থাৎ- ওলামাদের একটি জামাত এ হাদীস শরিফকে মাজার শরিফ সমূহে কাঁচা ফুল ও সুগন্ধি দেয়ার বৈধতা হিসেবে দলীল পেশ করে থাকেন।

বিশ্ববিখ্যাত মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থে শায়খুল আরব ওয়াল আযম আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

ومن ثم افتى بعض الائمة من متاخرى اصحابنا بان ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث وقد ذكر البخارى ان بريد ابن الخصيب الصابى اوصى ان يجعل فى قبره جريدتان

অর্থাৎ: আমাদের ওলামায়ে মুতাআখ্খিরীণগণ মাজার শরিফ সমূহে কাঁচা ফুল ও ডাল গাড়া এই হাদীসের আলোকে সুন্নাত বলেছেন। হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন, ইবনুল খাদীব সাহাবী তাঁর কবরে ডাল গাড়ার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন।

প্রসিদ্ধ ফিকাহর কিতাব "তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ্" কিতাবের ৩৬৮ পৃ: উল্লেখ আছে, صنع الريحان والجريد سنة

অর্থাৎ: কবরে সুগন্ধি ও ফুল অর্পণ ও ডাল লাগানোর যে রীতি আছে তা সুন্নাত।

বিশ্ববিখ্যাত ফত্ওয়া-এ-হিন্দীয়া যাকে ফত্ওয়া-এ-আলমগীরী বলা হয় এর ৫ম খন্ড "কিতাবুল কারাজিয়াত" জিয়ারাতুল কুবুর" শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে:

وضع الورود والرياحين على القبور حسن

অর্থাৎ: কবর সমূহের উপর ফুল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা উত্তম।

বিশ্ব বিখ্যাত হানাফী মাজহাবের "ফত্ওয়া-এ-শামী জিয়ারাতুল কুবুর" অধ্যায়ে উল্লেখ আছে:

ويوخذ من ذالك ومن الحديث ندب وضع ذالك لاتباع ويقاس عليه ما اعتيد فى زماننا من وضع الغصان الاس نحوه

অর্থাৎ: এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীস শরিফ থেকে এ সমস্ত জিনিস কবরের উপর রাখাটা মুস্তাহাব বুঝা যায় এবং এ সুবাদে কবরের উপর খেজুর গাছের ডালা ইত্যাদি দেওয়াটা আমাদের যুগে প্রচলিত আছে বিধায় তা মুস্তাহাব বলা যাবে।

উপরে উল্লেখিত কুরআন, হাদীস, মোহাদ্দেসীন ও ফত্ওয়ার কিতাবের আলোচনায় প্রমাণিত হলো সাধারণ মুসলমান এবং আউলিয়ায়ে কিরামগণের কবর ও মাজার সমূহে কাঁচা ফুল ও সুগন্ধি অর্পণ করা জায়েজ ও মুস্তাহাব। তবে মনে রাখতে হবে যেই আমলসমূহ পাপীদের পাপ হ্রাস করে, তা নেককার বান্দাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

আউলিয়ায়ে কিরামগণের মাজার শরিফের উপর গিলাফ চড়ানো

আউলিয়ায়ে কিরামগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তাঁদের মাজার সমূহে গিলাফ চড়ানো জায়েজ। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের সম্মান প্রকাশ এবং লোকেরা যাতে তাঁদেরকে নগণ্য মনে না করে এবং জিয়ারত করে ফয়েজ বরকত লাভ করে ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গিলাফ চড়ানো হয়। সকল মুসলমানদের কিবলা কা'বা শরিফে গিলাফ চড়ানো আছে। প্রত্যেক বছর সৌদি সরকার পরিবর্তন করে নতুন গিলাপ চড়ায়। তা এক মাত্র কা'বা শরিফের সম্মানার্থেই করা হয়। মদীনা শরিফে প্রিয় নবী রাসূলে পাক (সাঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদ্বিঃ) ও হযরত ওমর

ফারুক (রাঃ) রওজা শরিফেও গিলাফ চড়ানো আছে। তা শুধু সম্মান প্রদর্শনার্থে। বাগদাদ শরিফে হুজুর গাউসে পাক, আজমীর শরিফে সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নেওয়াজসহ বিশ্বের সকল দেশে ওলীআল্লাহ্‌গণের মাজার শরিফ সমূহে গিলাফ চড়ানো আছে সম্মান প্রদর্শনার্থে। শরিয়তের উসুল বা আইন হলো: কুরআন, হাদীস বা শরীয়ত বিরোধী নয় এমন কাজ করতে কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। কোন কাজকে না জায়েজ বলতে হলেই দলিলের প্রয়োজন। শরীয়তের সমস্ত ফত্‌ওয়ার কিতাবে এই আইন লিখা আছে। তারপরও এ বিষয়ের উপর কয়েকটি দলিল উপস্থাপন করছি। ঈমান মজবুত হওয়ার লক্ষ্যে।

বিশ্ববিখ্যাত হানাফী মাজহাবের ফত্‌ওয়ার কিতাব ফত্‌ওয়া-এ-শামীর ৫ম খন্ড কিতাবুল কারাহিয়াত আল লুবুছ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

قال فی فتاوی الحجة وتکره السنور علی القبور ولکن نحن نقول الان اذا قصد به التعظیم فی عیون العامة لا یحتقروا صاحب القبر بل جلب الخشوع لادب لاغافلین والزائرین فهو جائز لان الاعمال بالنیات

অর্থাৎ: ফত্‌ওয়া-এ-হুজ্জাতে উল্লেখ আছে যে, কবরে গিলাফ চড়ানো মাকরূহ। কিন্তু আমরা (হানাফীরা) বলতে চাই যে, বর্তমান কালে যদি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সম্মান বোধ প্রত্যাশা করা হয় যাতে কবরবাসীর প্রতি অবজ্ঞা করা না হয় বরং উদাসীন ব্যক্তিদের মনে আদব ভয়ের সৃষ্টি হয়। তাহলে গিলাফ চড়ানো জায়েজ। কেননা আমল এর ভাল মন্দ হলো নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

ফত্‌ওয়া-এ-শামীর এই আলোচনা হতে বুঝা গেল আল্লাহ্‌র ওলীগণের শান-মান প্রকাশ করার জন্য যে কোন বৈধ কাজ জায়েজ। হুজুর নবী পাক (সাঃ)'র যুগেও পবিত্র কা'বা শরিফে গিলাফ ছিল তিনি এটা নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই এসব যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য করা হয়েছে। অনুরূপ আউলিয়ায়ে কিরামগণের সম্মান মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য গিলাফ চড়ানো জায়েজ।

হানাফী মাজহাবের বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর "তাফসীরে রুহুল বয়ান" ১০ পারায় সূরা তাওবার انما یعمر مساجد الله من امن بالله এ আয়াতে তাফসীরে লিখেছেন-

فبناء القبات قبور العلماء والاولیاء الصلحاء وضع النور والعمائم والثیاب علی قبورهم امر جائز اذا کان القصد ذالک التعظیم فی اعین العامة حتی لا یحتقروا صاحب هذا القبر

অর্থাৎ: ওলামা, আউলিয়া ও পূণ্যাত্মাদের কবর সমূহের উপর গুম্বজ তৈরী করা, গিলাফ চড়ানো, পাগড়ী, চাদর চড়ানো জায়েজ যদি এর দ্বারা নগণ্য মনে না করে, যদি এ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

মাজার শরিফে বাতি জ্বালানো, আগর জ্বালানো ও গোলাপের পানি ছিটানো

আশেকানরা এসব কাজসমূহ মহান ওলীআল্লাহ্‌র সম্মান প্রদর্শন তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা নিবেদনের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ করে থাকে তাই সেগুলো পালন করতে গিয়ে যে, পয়সা খরচ হয় তা কখনো অপব্যয় বলা যাবে না যেহেতু নবী, ওলীদের মহব্বতের রাস্তায় খরচ হয় সেটাও "ফি সাবিলিল্লাহ্" বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় বলে খরচ হবে। এগুলো বিক্রি করে অনেক লোক তার জীবিকা উপার্জন করে।

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান শরিফের ১০ পারায় সূরা তাওবার انما یعمر مساجد الله من এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছেঃ

وکذا ایقاد القنادیل والشمع عند قبور الاولیاء والصلحاء وللاحلال للاولیاء فالمقصد فیها مقصد حسن ونذر الزیت والشمع للاولیاء یوقد عند قبورهم تعظیما لهم ومحبة فیهم جائز لاینبغی النهی عنه

অর্থাৎ: অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কিরাম ও পূণ্যাত্মাদের কবরের পার্শ্বে তাঁদের শান-মানের জন্য তৈল ও মোমবাতি তাঁদের মাজারের পার্শ্বে সম্মানার্থেই জ্বালানো হয় আর এ উদ্দেশ্যে মানত করা জায়েজ। এ ব্যাপারে নিষেধ করা উচিৎ নয়।

প্রসিদ্ধ কিতাব "হাদীকাতুন নাদীয়া শরহে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া" ২য় খন্ডের ৪২৯পৃ: উল্লেখ আছেঃ

اذا کان قبر ولی من الاولیاء اوعالم من المحققین تعظیما لمروحه اعلاما للناس انه ولی لیتبرکوا به ویدعوا الله تعالی عنده فیستحاب لهم فهو امر جائز

অর্থাৎ: আর কবর যদি কোন ওলী ও বিশিষ্ট আলিমের হয় তাহলে তাদের আত্মার প্রতি সম্মানের জন্য এবং জনগণের অবগতির জন্য, যাতে এটা ওলীর কবর বুঝতে পেরে ফয়েজ হাসিল করতে পারে এবং ওখানে বসে আল্লাহ্‌তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করতে পারে তাহলে বাতি জ্বালানো জায়েজ।

আল্লামা নাবলুসি (রঃ) রচিত বিশ্ববিখ্যাত "কাশফুন্ নূর আন্ আসহাবিল কুবুর" কিতাবে মাজার শরিফে বাতি জ্বালানো জায়েজ বলে উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানীদের জন্য সংক্ষেপে এতটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করি। ইসলামে ঈদের দিন, জুমার দিন, সুন্দর পোষাক, আতর, খুশবু ব্যবহার করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব বলে উল্লেখ আছে। মাজার শরিফ সমূহেও আতর, গোলাপ জল, আগর বাতি জ্বালানো ছিটানো উত্তম। এগুলো ইসলামী সাংস্কৃতির অংশ এগুলো জিন্দা রাখা বর্তমান অপসংস্কৃতির ঘোর তমশায় প্রত্যেকের ঈমানী ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে অনুধাবন করে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মাইজভাণ্ডারীত্বরীকা: সর্ববেষ্টনকারী ত্বরীকা

• আবুল ফজল মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী •

কলন্দরীয়া ত্বরীকার সম্পৃক্ততাঃ কলন্দরী ত্বরীকার মূল প্রতিষ্ঠাতার নাম হল হযরত শাইখ শরফুদ্দীন বু-আলী-কলন্দর (রাদ্বিঃ)। তিনি স্পেন দেশীয় বাসিন্দা ছিলেন। বু-আলী শব্দের অর্থ হল হযরত আলী (কঃ) এর সুগন্ধি, তিনি মওলা আলী (কঃ) এর ন্যায় ইশ্‌ক ও মশরবের অধিকারী ছিলেন। এ ধারার সাধকদের কতেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নিম্নে কয়েকটি কিঞ্চিত তুলে ধরা হলো–

অন্তরের পবিত্রতা অর্জনে সংসার আসক্তি মুক্ত থাকা। জাগতিক সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করা। তাই এ মশরবের অলিয়ুল্লাহদের মধ্যে চিরকুমার সাধক বেশি লক্ষিত হয়। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় ও হযরত আকদস (কঃ) খলিফাদের মধ্যে এ সহজাত প্রকৃতির অনেক লোক পরিলক্ষিত হয়। হযরত আকদস বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী সহজাত প্রকৃতিঅনুসারে গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের "ফয়েজ" দান হক্কুল ইয়াকীন" অর্জন কারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। তন্মধ্যে "মজজুবে মখজ" গণ ফয়েজ এ এলকায়ী বা ইত্তেহাদী প্রাপ্ত হয়ে সদা সর্বদা খোদা প্রেমে বিভোর চিত্তে থাকেন। এবং আল্লাহ্‌তা'য়ালার "মা'য়িত" হাসিল করেন। আল্লাহ্‌তা'য়ালার বাতেনী জগত সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে হাল ও প্রভাবশালী তাঁরা কুতুবিয়াত ও সাহেবে মকাম মর্যাদার অধিকারী হলেও দুনুকে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন না। (বেলায়তে মোতলাকা – ৬৫), পরনে তাদের জীর্ন শীর্ণ বস্ত্র বা কম্বল ধারী, জটাধারী ত্বরীকায় মাজজুবে মাখজগণের বিপুল উপস্থিতি রয়েছেন। অসিয়ে গাউসুল আযম (কঃ) তাদের পরিচয় মর্মে বলেন– "হযরত বু-আলী কলন্দর (রঃ) দিল্লীর মুসলিম বাদশাহের উপহার ফেরত দিয়া বলিয়াছিলেন; নিয়া যাও তোমার বাদশাহ একান্ত মোহতাজ ব্যক্তি। ফকিরের এত জিনিসের প্রয়োজন নাই। তোমার বাদশাহ এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও পররাজ্য জয়ে রক্তজাত কামনা করেন। তাহার ছোট দুটি চক্ষু অতৃপ্ত। আমার অন্তকরণ কামনা মুক্ত ও খোদা সন্তুষ্টি"।

হযরত আকদস (রাদ্বিঃ) অনেক সময় তাঁর সহধর্মীনীকে বলতেন– "দুনিয়া মুসাফিরের জায়গা এখানে আড়ম্বরের দরকার কী?" হযরত আকদস আড়ম্বরমূলক খুশি পছন্দ করিতেন না। কেহ 'শাদী' শব্দ উল্লেখ করিয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বলিতেন- "রসুলাল্লাহ এই জগতকে 'দারুল হাজান' (পেরেসানীর স্থান) বলিয়াছেন, তুমি আমাকে খুশি শুনাইতে আসিয়াছ?" (বেলায়তে মোতলাকা – ১২০)

এসব পর্যালোচনা করলেই পরিলক্ষিত হয় মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় কলন্দরী ত্বরীকার সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। মুফ্‌তি-এ-আযম, রুমীয়ে বাংগাল, খলীফায়ে বাবা ভাণ্ডারী আল্লামা মুফ্‌তি বজলুল করিম মন্দাকীনীর (রঃ) একটি কালামে তা কিঞ্চিত সুস্পষ্ট হয়, যেমন "আমি শরাবী চলেছি পন্থে/সরে দাঁড়াও হে যত সুফিগণ। লাগিবে গন্ধ হইবে মন্দ/মলিন হবে তোদের সুফিতন" আমি বেচারা প্রেমেরি মরা/প্রেম শরাবে হই আত্মহারা/না করি পরওয়া তোদেরী ফতোয়া/নীতি বিধানের নিয়ম পালন।"

কলন্দরী ত্বরীকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা মর্মে বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থকার বলেন- 'কলন্দরী হযরত বু-আলী কলন্দরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। তিনি তৌহিদে আদয়্যান মজহাবের অনুসারী ছিলেন।" আউলিয়া কামেলীনগণ খোদা তা'য়ালার ইচ্ছা শক্তি ও হেকমত অনুযায়ী করেন, তা রুসুমে শরার অনুরূপ না হলেও উসুলে শরার বিরোধী নয়। নবী (আঃ) গণের যুগোপযোগী বিধান গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত নৈতিক ধর্ম ও উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। এ মতবাদের সাথে শাইখুল আকবর ইবনুল আরবী (কঃ) আমের ইবনুল ফারেস (রঃ), জালালুদ্দীন রুমী (রঃ), হযরত আবুল করিম জিলী (রঃ), হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রঃ) প্রমুখ মাশাইখদের মধ্যে এর সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্ট। যেমন ধনঞ্জয় নামে এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে প্রতিকূল পরিস্থিতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে হযরত আকদস মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাকে বলেন– "তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" এক হিন্দু বাবু মুন্সেফকে হযরত আকদস বলেন– "নিজের হাতে পাকাইয়া খাও। পরের হাতে পাকানো খাইও না। আমি বারমাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও"। এরূপ অসংখ্য ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত যে, কলন্দরীদের ন্যায় মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় অসাম্প্রদায়িকতা ও সর্বজনীনতার সম্পৃক্ততা রয়েছে।

হযরত শাইখ শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দর (রঃ) ছিলেন কঠিন "রিয়াজত" অবলম্বনকারী। তাঁর আত্মজীবনী অধ্যয়নে তাঁর কঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগের চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি তাঁর পীর মুর্শীদ আশেকে মওলার (রঃ) হাতে বায়াত গ্রহণের পর, তাঁর পীর মুর্শীদের সম্মুখে অবস্থিত নদীর পানিতে তিনি নেমে কঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন, আহার নিদ্রা ছাড়া তিনি একাধারে বার বৎসর এ রিয়াজতে নিযুক্ত থাকেন। এতে তাঁর দেহের নিম্নাংশ যা পানিতে ছিল তাতে পঁচন ধরে। এ অবস্থায় হযরত খিজীর (আঃ)-এর সাথে তিনি সাক্ষাত লাভ করেন এবং ঐশীবাণী প্রাপ্ত হন যে, "হে শরফুদ্দীন! তোমার এতোদিনের কঠোর সাধনায় আমি মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট"। হযরত বু-আলী কলন্দর (রঃ) এ ঐশীবাণী মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালার তা বুঝা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভীষণ ভেদ ভাংগার জন্য শাহানশাহে বেলায়ত মওলা আলী (কাঃ)কে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আলী (কাঃ) তাঁকে

কোলে নিয়ে পানির উপর আসলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এভাবে হযরত বু-আলী কলন্দর (রঃ) রিয়াজত সম্পাদনের পর আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমে তাঁর পথে বের হলেন। ইশ্‌কে হাকীকীতে উন্মত্ততার দরুন তাঁর দাড়িগোঁফ এত লম্বা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় আবৃত হয়ে গেল।

অনুরূপ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অনেক মহাত্মাগণকে হযরত বু-আলী কলন্দর (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মত কঠোর রিয়াজতকারী রূপে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত হযরত গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) খোলাফায়ে কেরামদের মধ্যে এ মশরবের গুণাবলী সম্পন্ন অলীয়ুল্লাহ্‌গণের উপস্থিতি বেশী। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) স্বয়ং নিজে এবং তাঁর অনেক খলিফাগণ কলন্দরীদের ন্যায় গভীর বনজংগলে সাধনা রিয়াজত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এ রিয়াজত সমূহের নমুনা মানবের সাধ্যাতীত বলেও মনে হয়। বস্তুত এ ত্বরীকায় প্রত্যেকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততানুসারে ফয়েজ বিতরন করা হয়েছে। মানব সমাজে অলীয়ুল্লাহ্‌গণের অনুপস্থিতি কখনো শুভ নয়। আজ মোল্লা নিয়ন্ত্রিত সমাজে এ প্রকৃতির ওয়ালীয়ুল্লাহ্‌গণের অনুপস্থিতি সন্ধানীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

মওলভীয়া ও চিশ্‌তীয়া ত্বরিকার সাথে সম্পৃক্ততাঃ উপমহাদেশে ঈমান ইসলামের পিছনে চিশ্‌তীয়া ত্বরীকার মাশাইখদের ভূমিকা দিবালোকের ন্যায় সত্য। এদেশে ইসলাম প্রচারে গরীব নেওয়াজ (রঃ) 'গান বাদ্য বাজনা প্রিয়' এদেশের মানুষকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত "হিকমত ও মওইজায়ে হাসনা" রূপক সেমা মাহফিলের প্রচলন করেন। তিনি রূহানী শক্তির মাধ্যমে সংগীতমুখী মানুষকে মাহফিলে সামার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও রাসূল (দঃ) মুখী করতে সমর্থ হন। তাই সেমা বা আধ্যাত্মিক সংগীতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (সঃ) প্রশংসা করা এটি চিশ্‌তিয়া ত্বরীকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জীবনালেখ্যে আমরা তাঁকে সেমা শ্রবণ, কখনও বা সেমা মাহ্‌ফিলের বৈঠকে বসার নির্দেশ বা কখনো সেমা মাহ্‌ফিল করার নির্দেশ দিতেন। ভূমিকায় ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক পূর্ণাংগ ত্বরীকা শরীয়তের উসূলকে ঠিক রেখে স্থান কালের আনুকূল্যে ত্বরীকার কর্মপদ্ধতি সমূহের দ্বারা যুগের হাইয়্যুল কাইয়্যুম ইমামুত ত্বরীকতগণ মানব জাতির হেদায়তের পথ দেখিয়েছেন। যা তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের হিকমত রূপী বিবেচনা করেছেন। এ প্রসংগে অসিয়ে গাউসুল আযম মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বলেন- মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকায় বাদ্যযন্ত্র নিয়া জিকির করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নাই। সেহেতু গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সমাবেশ ও সংমিশ্রন স্থলে আত্মপ্রকাশিত মোজাদ্দেদ আউলিয়া। গান বাজনা ও গজল গীতিকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জিকিরি উপাদান বা হেকমত হিসাবে অনুমোদন ও করার অনুমতি দিতেন। (বেলায়তে মোত্তলাকা – ১৬৮)

চিশ্‌তীয়া ত্বরীকার মাশাইখদের মধ্যে বিশেষত হযরত গরীবে নেওয়াজ (রঃ) যেভাবে সংগীতপ্রিয় ভারতবাসীকে মজাকী রুচিবোধ রূপে দেখেন এবং তিনি এ ইশ্‌ক-এ-মজাজীর এ ধারাকে তাঁর ফয়েজ ও বেলায়তী শক্তি দিয়ে ইশ্‌ক-এ-হাকীকীতে পরিণত করেন। সংগীতের এ জজবাকে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমের জজবায় রূপান্তরিত করেন এবং তিনি ভারতবর্ষে এ কৌশল অবলম্বনে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছিলেন। কারণ গরীবে নেওয়াজের ভারত বর্ষে এ কৌশল অবলম্বনে সরকারে দো জাহান (দঃ)'র রূহানী নির্দেশনা ছিল। হযরত আকদস মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আধ্যাত্মিক সংগীতকে অব্যর্থ কৌশলরূপী প্রয়োগ করলেন, তাঁর এ দয়া মেহেরবাণীতে অশ্লীলতা ও বেহায়াপূর্ণ গান বাজনায় আসক্ত মানব ধ্যানকে সম্পূর্ণ উল্টো গতিতে ফিরিয়ে তা "জজবাতুন মিন মিন জজ্‌বাতিল্লাহ্‌" বা "আল্লাহ্‌ প্রেমের একটি গতিতে" পরিণত করেন।

অনুরূপ মৌলাবিয়া ত্বরীকার প্রবর্তক, আরেফ বিল্লাহ্‌ মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)'র ত্বরীকার সাথে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার সম্পৃক্ততা রয়েছে। মওলানার প্রবর্তিত এ ত্বরীকার "হামাউস্ত" একটি বহু আলোচিত মতবাদ। বাংলায় এর সমার্থক শব্দ হল "অদ্বৈতবাদ" বা আল্লাহ্‌ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নেই। আর এ মতবাদের সাথে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার "তৌহিদে আম্বিয়ান" দর্শনের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। এ ছাড়াও মওলানা রুমী (রঃ) ছিলেন ধর্মীয় সংগীত ও নৃত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগী। তিনি তাঁর মসনবী শরীফে আল্লাহ্‌র ধ্যানে গান বাজনা করা ও নৃত্য করার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর অনুসারীরা ইউরোপে DANCING DERVISH যা নৃত্যকার দরবেশ নামে পরিচিত। কেননা তারা গান বাদ্য সহকারে ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকারে নাচেন।

খলিফায়ে গাউসুল আযম মুফ্‌তিয়ে আযম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ) 'আত্‌ তাওজিহাতুল বাহিয়্যাহ্‌' গ্রন্থে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার প্রচলিত সেমা বা আধ্যাত্মিক সংগীত পূর্ব এ রীতিকে হিকমত পূর্ব কৌশল ও আল্লাহ্‌ প্রেমে বিগলিত হওয়ার পদ্ধতি ও গোপন প্রেমের রহস্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। ('আত্‌ তাওজিহাতুল বহিয়্যা'র পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাইওয়ানী স্তরে নিমজ্জিত মানবতাকে ফজীলতে রব্বানীর মাধ্যমে অন্তরে রূহানী জাগরণের জন্য গান-বাজনাকে হেকমত বা কৌশল রূপে প্রয়োগ করেছেন।

জোনাইদী, কাদেরী ও সহরোয়ারদী ত্বরীকার সাথে সম্পৃক্ততাঃ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ত্বরীকার সাথে সহরোয়ারদী, কাদেরী জুনাইদী ত্বরীকার ধারাবাহিকতা রয়েছে। সহরোয়ারদী ত্বরীকার প্রবর্তক হলেন হযরত শাইখ শাহাবুদ্দীন শহরোয়ারদী (রঃ)। তিনি ছিলেন পীরানে পীর দস্তগীর শাইখ

আব্দুল কাদের জীলানী (কঃ)'র খলিফা। হযরত শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী (কঃ) হলেন কাদেরীয়া ত্বরীকার ইমাম বা প্রবর্তক। আর হযরত শাইখ জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) হলেন, পীরনে পীর দস্তগীর (কঃ)'র উর্ধতন শাইখ। তিনি জুনাইদীয়া ত্বরীকার প্রবর্তক ও ইমাম। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার উর্ধতন শাইখদের মধ্যে এ তিন ত্বরীকার ও মহান বুজুর্গানেদ্বীনদের সম্পৃক্ততা অনুমোদনও করার অনুমতি দিতেন"- (বেলায়তে মোতলাকা - ১৬৮)

চিশতীয় ত্বরীকার মাশাইখদের মধ্যে বিশেষত হযরত গরীবে নেওয়াজ (ক.) যে ভাবে

করখীয়া ত্বরীকার সাথে সম্পৃক্ততাঃ মাইজভাণ্ডার দরবারের ভক্ত, মুরীদ, আশেক অনুসারীদের মধ্যে সকল ধর্ম-বর্ণ মুসলিম, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, কুমিয়া, চাকমার অন্তর্ভূক্ত। সকল ধর্ম বর্ণের লোক এ দরবারের মধ্যে যাতায়াত করে। ধর্ম-সাম্য সকল ধর্মের অনুসারীদের সহাবস্থান ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এ ত্বরীকার অন্য একটি বৈশিষ্ট। হযরত আকদাস (কঃ) বাবা ভাণ্ডারী ও তাঁদের বুজুর্গ খলিফাদের ফজিলতে রব্বানীর জন্য মুসলমান হতে হবে এমন নয়। দুর্ভাগ্যঅনেক মুসলমান নামধারী হযরত গাউসুল আযমের দয়া ও ফজীলত হাসিলের সৌভাগ্য তাদের হয়নি। আবার ভিন্ন ধর্ম বা জাতির লোকেরা হযরত আকদাস ও বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ও তাঁদের খোলাফায়ে কেরামদের সুনজরে পড়ে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় ভূরি ভূরি। এখানে কে কোন ধর্ম বা জাতির তা মুখ্য নয়। সবাই এক আল্লাহ্‌তা'য়ালার সৃষ্টি - এ দৃষ্টি ভংগিতে ধর্মসাম্য ও আদলে মোতলাকই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা সার্বজনীন মুক্তির দর্শনরূপে বিবেচিত ও সূফি মতবাদ ও দর্শনের মূলকথা। যা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় ৬০নং আয়াত, ৬২নং আয়াত ও সূরা মায়েদার ৪৮নং আয়াতের মর্মাবহ। এ প্রকারের বৈশিষ্ট পূর্ববর্তী মাশায়েখদের ত্বরীকতের লক্ষ্যণীয়, যেমন- 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' ও 'সিয়ারুল আখবার' গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি করখীয়া ত্বরীকতের ইমাম শাইখ মারুফ করখী (রঃ)'র দরবারেও সকল জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সকলের সহাবস্থান ছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দারা ঐ সকল বুজুর্গ অলীয়ুল্লাহ্‌গণ, যারা নবী (দঃ)'র উসওয়াতুল হাসনার অধিকারী তাদের দরবারসমূহ সকলের মিলনমেলা হত। হযরত মারুফ করখী (রঃ) ছিলেন কারখীয়া ত্বরীকার প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আওলাদে রসূল (দঃ) ইমাম আলী বিন মুসা রেজা (রাদ্বিঃ) ও হযরত শাইখ দাউদ তায়ী (রাদ্বিঃ)'র সান্নিধ্যে রূহানী, জাহেরী, বাতেনী ফয়েজ হাসিল করেন। তাঁর ত্বরিকায় জাতি-ধর্ম-বর্ণের সহাবস্থান ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার দৃষ্টান্ত ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত মারুফ কারখী (রঃ) ইন্তিকালের পর সকল ধর্মের লোক তাঁর জানাজা বহনের জন্য অভিমত প্রকাশ করেন, এক বর্ণনায় রয়েছে যে সম্প্রদায়ের লোক তাঁর জানাজার খাট উত্তোলন করবে তারাই তাঁর দাফন কাফনের কার্যাদী সম্পাদন করবে, অবশেষে মুসলমানগণ তাঁর জানাজা বহন এবং দাফন কাফনের কার্যাদি সম্পাদন করেছেন, অপর বর্ণনায় রয়েছে- প্রথমে ইয়াহুদী সম্প্রদায় করেছেন, অপর বর্ণনায় রয়েছে- প্রথমে ইয়াহুদী সম্প্রদায় চেষ্টা করেছে, তারা ব্যর্থ হলে "মওজুছি" সম্প্রদায়ের লোকেরা তা সম্পাদন করেছেন।

বস্তুতঃ ত্বরীকায়ে করখীয়ার সাথে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার যে সম্পৃক্ততা তা আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পৃথীবির সকল ধর্ম-বর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিরল আদর্শ। রক্তপাত হানাহানি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির জন্য আজ সকল ধর্ম-বর্ণের সহবাস্থান যুগ ও সময়ের দাবী। তাই মাইজভাণ্ডারী দর্শনের এ স্লোগান একটি সুন্দর পৃথীবি সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহ্বান করে।

হযরত শাইখ মারুফ করখী (রঃ) হিজরী ২য় শতাব্দীতে ৬ মহরম ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর মাজার শরীফ বাগদাদে অবিস্থত।

ত্বরীকায়ে খিজরীয়ার সাথে সম্পৃক্ততা ঃ খিজরী ত্বরীকা বলতে এখানে খিজরী মশরবই উদ্দেশ্য। মাইজভাণ্ডারী ত্বরীক রহস্যপূর্ণ বৈশিষ্টমন্ডিত খিজরী "মশরব" বা সহজাত প্রকৃতিতে প্রবর্তিত। হযরত খাজা খিজির (আঃ)-এর সাথে ত্বীরকায়ে মাইজভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আযম শাহ্‌সূফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ), হযরত গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী ও এ মহান দু-সত্ত্বার অনেক খোলাফায়ে কেরামগণের সম্পর্ক ছিল। এ ত্বরীকার শায়েখদের সাথে হযরত খিজির (আঃ)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান হেতু ত্বরীকায়ে মাইজভাণ্ডারীকে খিজরী মশরবের ত্বরীকা বলা হয়। হযরত গাউসুল আযম ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) জীবনালক্ষ্যের অনেক উক্তি ও ঘটনা সেদিকে ইংগিতবহ। যেমন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র উক্তি, "তিনি মুসাবীয়া ত্বরীকার লোক, খিজরী কাজ কারবার তিনি কি বুঝিবেন? বাহাস করিও না। তোমরা তোমাদের হালতে থাকিয়া যাও?" এছাড়া খাজা খিজির (আঃ)'র সাথে সংগঠিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি হযরত গাউসুল আযম (কঃ) প্রতিষ্ঠিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় তাঁর সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট হয়। যেমন- একদিন রমযান মাসে সেহরীর সময় হযরত সাহেবানী হযরত সাহেবকে বললেন, "ফকিরে ফকিরে তনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। কই আপনি তো আমাকে কখনও কোনদিন খিজির (আঃ) কে দেখাইতে পারিলেন না।" ইহাতে হযরত হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "সত্যিই কি আপনি খিজির (আঃ) কে দেখিতে চান?" এটা বলে তিনি ধ্যানে মগ্ন হলেন। হযরত সাহেবানী সেহরী খেয়ে কুলি ফেলার জন্য দরজা খুলতেই দেখতে পেলেন, একজন সৌম্যমূর্তি শুভ্রসদন পরিহিত লোক বাইরে আংগিনায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দরজা বন্ধ করে হযরত সাহেবকে বললেন, "এই লোকটি কে? বাহির বাড়ীতে যাইতে বলুন। এখানে আমার অসুবিধা হইতেছে।" হযরত উত্তর করলেন, "আপনি যাহাকে দেখিতে

চাহিয়াছিলেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তো আসিয়াছেন।" হযরত সাহেবানী ভাল করে তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর সাথে হযরতের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দেখে বিস্মিত হলেন।

খিজরী মশরবের অলিয়ুল্লাহ্‌গণের কাজ কারবার সাধারণের দৃষ্টিভংগীর বাইরে। অনেক সময় তাঁদের কর্মকান্ড শরীয়ত বিবর্জিত দৃশ্যতঃ মনে হলেও তা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীনের বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা কাহাফের হযরত মুসা ও খিজির (আঃ)'র মধ্যে সংগঠিত ঘটনাটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাতে "বেশরা আখ্যা দিয়ে সমালোচনার সুযোগ নেয়া নিতান্ত অজ্ঞতা ও জেহালতী। এ ছাড়া হযরত আকদস মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) অনেক কারামত তাঁর খিজিরী মকামের ইংগিত প্রমাণ করে, যেমন-

১. ধুরুং খালের গতি পরিবর্তন।
২. কুলজম শাহের সাথে সাগর গর্ভে তাঁর সম্পর্ক।
৩. সাগর ডুবিতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ভক্ত উদ্ধার।
৪. সূর্যের উপর প্রভাব।
৫. বিপরীত দ্রব্যাদি প্রদানে রোগমুক্তি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম (কঃ)'র হিকমত ও রহস্যপূর্ণ কার্যাদী খিজরী মশরবের ইংগিত বহন করে। যেমন-

১. দা' এর আঘাতে হেদায়ত আলী নামক খাদেমকে মৃতবৎ করা, পরক্ষণে আবার জীবন লাভ।
২. হালদা নদীর পানির উপর উপবেশন করে সর্তা খালের মুখ পর্যন্ত গিয়ে কুলে অবতরণ।
৩. বিপরীত দ্রব্য ভক্ষন করিয়ে রোগমুক্তি ইত্যাদি।

মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অন্যতম, মজজুব অলীয়ুল্লাহ্ সাতগাছিয়া দরবারের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ খলিফায়ে বাবা ভাণ্ডারী হযরত আবুল ফজল মুহাম্মদ ইউনুচ মিয়া (রঃ) সুলতানপুরী একজন খিজরী মশরবের বুজুর্গ ছিলেন, তাঁর আচার আচরণ কথাবার্তা ছিল সাধারণের জ্ঞানের বাইরে। তিনি ছাত্রাবস্থায় কলকাতা আলীয়ায় অধ্যয়নকালে হযরত খিজির (আঃ)'র সাথে সাক্ষাতের জন্য ৭ মাস ভারত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপে অবস্থান, কলকাতা নখদো মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনকালে প্রায়সময় হযরত খিজির (আঃ)'র সাক্ষাতের জন্য অজানা স্থানে চলে যেতেন, ভারত মহাসাগরের মধ্যে বিপদগ্রস্ত এক ভক্তকে তাঁর খড়ম নিক্ষেপ করে ডুবন্ত জাহাজসহ সকলকে উদ্ধার, কুড়াল দিয়ে গাছ কাটিয়ে এক ভক্তের কামড়ী রোগের পরিত্রান, ইন্তিকালের উনচল্লিশ বৎসর পর একানব্বইয়ের বন্যার সময় এক ভক্তকে পানিতে ডুবে যাওয়া পুকুর পাড় হতে তালাবদ্ধ মসজিদের ভিতরে খাটিয়াতে বসিয়ে দেয়া - ইত্যাদি অসংখ্য রহস্যপূর্ণ কাজ ও কারামতসমূহ তাঁদের খিজরী মশরব ও মকামের পরিচয় বহন করে।

সর্ববেষ্টনকারী ত্বরীকা ঃ ইসলামে সুফিবাদে আজ অবধি যতগুলি ত্বরীকার প্রবর্তন হয়েছে, তার মধ্যে সর্বশেষ যুগোপযোগী ত্বরীকা হল একমাত্র বাংলাদেশে উদ্ভাবিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা। এ ত্বরীকা হল একটি ধর্মীয় বিপ্লব, আদর্শ আধ্যাত্মিক চেতনা, পার্থিব ও নৈতিক জীবনের পরাকাষ্ঠা অর্জনের পন্থা, খোদাতা'য়ালার নৈকট্যলাভের দুর্লভ সুযোগ, ইহ ও পরকাল রক্ষা করা, চিরশান্তির কপোত, সর্ববেষ্টনকারী আন্দোলন, পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মসাম্যের সার্বজনীন আবেদন সমৃদ্ধ মানবতাকামী এক মহান ত্বরীকা। যা পূর্বেকার সুফি ও ত্বরীকাসমূহের অনুকূলে স্থান কালের চাহিদায় এদেশের সমাজ সংস্কৃতিতে অশ্লীল বেহায়াপনা মুক্ত করে রূহানীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। এ ত্বরীকায় পূর্ববর্তী আদয়্যান এ-সাবেক্তা বা অতীত ধর্মাদি ও বিভিন্নমুখী ত্বরীকত পন্থার "জামেয়ে তানজীহ্ ওয়াত তশবীহ" অর্থাৎ- ধর্মের সূক্ষ্ম এবং স্থূল দিকের সমাবেশকারী বলে সাব্যস্ত হয়। এ প্রসংগে অসিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) 'মূলতত্ত্ব' পুস্তিকার ১ম খন্ডে বলেন- যুগের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার তাগিদে বিভিন্ন বুজুর্গানে দ্বীনেরা ভিন্ন ভিন্ন ত্বরীকা ও সফলতা পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহাতে (১) অজিফা (২) দরুদ (৩) তেলাওয়াতে কুরআন (৪) তেলাওয়াতে অজুদ (৫) আল্লাহ্‌তা'য়ালার নামাবলীর স্মরণার্থে জলী-খফী জিকির (৬) ফিকির (৭) সংযম (৮) প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি অনন্তপন্থার সন্ধান দিতে দেখা যায়। বস্তুত পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন ত্বরীকার কার্যপ্রণালী পন্থাসমূহ মৌলিক দিক দিয়ে এ ত্বরীকায় বিদ্যমান, তাই যে কোন স্বীকৃত ত্বরীকতপন্থি এ ত্বরীকার উপর আস্থাশীল হয়ে সফল হতে সমর্থ হবেন। এটি মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা যে সর্ব ব্যষ্টনকারী মজমুয়া বা যুগোপযোগী ত্বরীকা তারই প্রমাণ বহন করে। তাই অসি-এ গাউসুল আযম (কঃ) তাওয়াল্লাদ-এ-গাউসিয়া পুস্তিকায় উল্লেখ করেন "মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা সমস্ত ত্বরীকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী কাদেরীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, সারওয়ার্দীয়া, তাইফুরীয়া, জোনাইদীয়া ইত্যাদি ত্বরীকা এর অন্তর্ভুক্ত (মূলতত্ত্ব পৃঃ ৮)

একুশ শতকের এ প্রান্তে বিশ্বে নৈতিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতিতে বিকলাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠছে। এ অবক্ষয়ের নেপথ্যে কাজ করছে জৈবিকতা ও অপ্রশিক্ষিত রিপু। এ রিপুর দৌরাত্ম্যে মানব বিবেকশূন্য হয়ে অজ্ঞানতা, কু-সংস্কার এবং অপকর্মে লিপ্ত। সাম্য, মৈত্রী, সামাজিক ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠার পথে চরম বাধা হচ্ছে এ ক্রিয়াশীল বড় রিপু। এসকল অবস্থা থেকে মানবতার মুক্তির সহজ পথ হলো আধ্যাত্মিক সাধনা, অসীম ত্যাগ তিতীক্ষা, জৈবিক তাড়না ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ। এহেন অবস্থায় মানব সমাজের মুক্তিকল্পে আধ্যাত্মিক জাগরণ অপরিহার্য। মাইজভাণ্ডার দরবার জ্ঞানীদের দরবার, আলোর

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কুঃ) এর "তাছনিফাত"

• শাহ্জাদা মাওলানা সৈয়দ মোকাম্মেল হক শাহ্ ফরহাদাবাদী •

মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত মুফতীয়ে আযম সৈয়দুল মুনাজেরীন বাহরুল উলুম সাহেবুত্ তাহরীর ওয়াত্ তাছনীফ শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) এর কলমের ক্ষুরধার লেখনীসমূহ ইসলামের মূলধারা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর এক কালজয়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষত: তাসাউফ বিরোধী জাহেরী জ্ঞানের নামধারী বাতিল ফেরকার মুখোশ উন্মোচনে এই ক্ষণজন্মা মহাজ্ঞানীর লেখনীর বিকল্প নেই। তাঁর প্রতিটি "তাছনিফাত" তথা রচিত কিতাবাদি বিশ্বব্যাপি সমাদৃত ও প্রশংসিত। যুগের প্রত্যেক খ্যাতনামা আলেম-ওলামাগণ তাঁর রচিত ফত্ওয়া সমূহকে সমর্থন ও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়সমূহের কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে তিনি সুস্পষ্টভাবে ফয়সালা দান করেছেন। ইসলামের নামে কোন ভ্রান্ত আক্বীদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার সাথে সাথে মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) তাঁর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছেন কোন না কোন কিতাব রচনা কিংবা মুনাজেরার মাধ্যমে। মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) এর রচিত প্রতিটি কিতাব সমূহ হচ্ছে গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক। শরীয়ত ও ত্বরিকতের প্রতিটি বিষয়ে ছিল তাঁর গবেষণাপূর্ণ সুদূরপ্রসারী পদচারণা। গাউসে আমিন মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) এর লিখিত প্রতিটি কিতাব উচ্চাঙ্গ আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। নিম্নে তাঁর লিখিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিতাবাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

১। শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফি তারদিদে মা-ফি রাফেউল ইশ্কালাত:

উপরোক্ত কিতাবখানির নাম উচ্চারণেই বুঝা যায় যে, কোন কিতাবের খন্ডনেই তা রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে যখন এ দেশে সর্বপ্রথম বাতিল আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) "শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফি তারদীদে মা-ফি রাফেউল ইশ্কালাত" নামক কিতাব রচনা করেই বাতিল আক্বীদার লেখনীকে চিরতরে কবর রচনা করেন। তৎকালীন হাটহাজারী মাদ্রাসার মোদারেছ মেখল নিবাসী মৌলভী ফয়জুল্লাহ সাহেব তার রচিত "রাফেউল ইশ্কালাত" নামক কিতাবে ওজরত বা ধর্মীয় পূণ্যময় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, উরসুন্নবী (দঃ), মিলাদ-কিয়াম, দরূদ, আউলিয়ায়ে কেরামের ওরশ পালন করা, ইছালে ছওয়াব পালন করা, কবরের নিকট ছওয়াব বখ্শিশের উপলক্ষে কুরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি পূণ্যময় কাজকে বেদ্আত ও নাজায়েজ বলে ফত্ওয়া প্রদান করে। যা ৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি ক্ষুদ্র রেসালা মাত্র। সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) কালবিলম্ব না করে মৌলভী ফয়জুল্লাহর লিখিত উক্ত "রাফেউল ইশ্কালাত" নামক কিতাবের খন্ডনে ৩২০পৃষ্ঠা সম্বলিত এক বিশাল কিতাব রচনা করেন। আর তার নামকরণ করেন, "শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফি তারদীদে মা-ফি রাফেউল ইশ্কালাত।" যার মধ্যে উল্লেখিত বিষয়াদি জায়েজ ও আমলের বৈধতার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সহকারে ফতওয়া প্রদান করেন। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিদ্যমান। এই কিতাবের প্রশংসায় ইমাম আল্লামা আযীযুল হক শেরে বাঙ্গালা (রহঃ) স্বরচিত "দিওয়ানে আজীজ" নামক গ্রন্থে বলেন–

উচ্চারণ: "মৌলভী ফয়জুল্লাহরা দিল শুদছো লা দাগেদার
বর খেলাফশ ছো শাওয়াহেদ পেশে করদাহ্ না-মেদার"

অর্থাৎ: মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর আকীদা সম্বলিত কিতাবের লেখক হাটহাজারীর মৌলভী ফয়জুল্লাহ লিখিত "রাফেউল ইশ্কালাত" নামক কিতাবের খন্ডনে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) যখন "শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফি তারদীদে মা-ফি রাফেউল ইশ্কালাত" নামক মহামূল্যবান ফত্ওয়ার কিতাব রচনা করে জনসম্মুখে পেশ করলেন তখন মৌলভী ফয়জুল্লাহর অন্তর ভেঙ্গে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল (দিওয়ানে আজীজ)।

মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) রচিত কিতাবখানি সর্বপ্রথম ১৯২৮ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লির "বরকাই" নামক প্রেস হতে প্রকাশিত হয়। **অতঃপর উক্ত কিতাবখানি পুনরায় ফরহাদাবাদ দরবারের সাজ্জাদানশীন রাহনুমায়ে শরীয়ত ও পীরে ত্বরিকত মুফতি আল্লামা সৈয়দ মোজাম্মেল হক শাহ ফরহাদাবাদী (মা:জি:আ:) কর্তৃক বিগত ২০১১ সালে নতুন আঙ্গিকে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।**

২। বেদাফিউস্ শুবহাত ফী জাওয়াজিল ইস্তিজারি আলাত্ তায়াত:-

ধর্মীয় পূণ্যময় কাজ যেমন- ইমামতির দায়িত্ব, কুরআন শিক্ষা দান ইত্যাদি আদায় করে ওজরত বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, কবরের পার্শ্বে কবরবাসীর উপকারার্থে দিন নির্দিষ্ট করে পবিত্র কুরআন পাঠ করা, ময়্যতের উপকারার্থে তাসবীহ, তাহলীল পড়া দিন নির্দিষ্ট করে চারদিন বা কুলখানি আদায় করা ইত্যাদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার আলোকে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ফুকাহায়ে কেরামগণের অকাট্য দলিলাদি দ্বারা জায়েজ প্রমাণিত করে মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) যে কিতাব রচনা করেন তার নাম হচ্ছে "বেদাফিউস্

শুবহাত ফী জাওয়াজিল ইস্তিজারি আলাত্ তায়াত।" সর্বপ্রথম ১৯০১ সালে ভারতের কানপুর প্রদেশের "কাইয়্যুমী" নামক প্রেস হতে এ পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতদ্অঞ্চলে সুন্নিয়তের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত কিতাব।

৩। তোহফাতুল আখ্ইয়ার ফী দাফ্-ই শারারাতিল আশ্রার:

উক্ত কিতাবখানি ইমামুল ওলামা আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) কর্তৃক লিখিত একটি বহুল প্রচারিত ও প্রশংসনীয় কিতাব। যা ছুফি-তাসাউফের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছে। আর এই বিষয় সমূহ হচ্ছে-নির্দোষ ছেমা মাহফিল, পীরের সম্মানার্থে সিজদায়ে তাজিমী বা তাহিয়্যা, পীরের আদব, সহীহ্ সিলসিলা বা সাজ্রাভুক্ত পীরের হাতে বায়আত গ্রহণ ও ইলমে তাসাউফ। বিশেষতঃ উল্লেখিত বিষয়াবলী ত্বরিকায়ে মাইজভান্ডারী ও বিশ্বের অন্যান্য আরো বহু হক ত্বরিকার এক অবিচ্ছেদ্য অমূল্য বিষয়। ত্বরিকতের অনুসারীরা ইশ্কে ইলাহীতে মগ্ন হয়ে নিজ অন্তরাত্মাকে যাবতীয় খারাবী থেকে মুক্ত রেখে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান-গজলাদি পাঠ করে সমা মাহফিল করে। ছেমা মাহফিলে আল্লাহ্র প্রেমে মত্ত হয়ে রুকূছ (নৃত্য) বা অজ্দ করা, নূরে মুহাম্মদির বিকাশস্থল ও খোদায়ী জগতের গোপন রহস্যের অধিকারী মহান আউলিয়ায়ে কেরামগণের সম্মানার্থে নিজ নিজ আশেক-ভক্ত মুরিদগণ সিজ্দায়ে তাহিয়্যা বা সম্মানসূচক সিজ্দা করে। কেননা এই সম্মানী সিজ্দা দ্বারা বিনয় প্রকাশ মুরিদানগণের উচ্চ মর্তবা হাসিল করার মধ্যে সমস্ত ফজীলত অন্তর্নিহিত। ত্বরিকতপন্থীরা যখন এ সমস্ত জায়েজ কার্যাদি আদব ও ভক্তি সহকারে পালন করতে লাগল তখন কিছু মারেফাতশূন্য জাহেরী ইলমধারীরা শির্ক ও বিদয়াত ফতোয়া দানে লিপ্ত হয়। তখন এ সমস্ত ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদীদের বক্তব্য খন্ডনে ক্ষুরধার কলমের মাধ্যমে কলম সম্রাট আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলিলাদি দ্বারা উল্লেখিত বিষয়াদির বৈধতা প্রমাণে "তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার ফী দাফ্ই শরারাতিল আশ্রার" নামক বিশ্বনন্দিত ফাত্ওয়ার কিতাব রচনা করেন। আর উক্ত কিতাবের প্রণীত ফত্ওয়ার গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে লেখকের সম্মানিত পীর-মুরশিদ ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (কঃ) দস্তখত করেছিলেন এবং মাকবুলিয়াতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া প্রার্থনা করেছিলেন (বেলায়তে মোত্লকা)।

উক্ত কিতাবখানা লেখক আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) সর্বপ্রথম ১৩১৩ বাংলা মোতাবেক ১৯০৪ সালে রচনাপূর্বক তৎকালীন প্রচলিত বাংলা পুঁথিসাহিত্যে অনুবাদ সহকারে ১ম প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে লেখকের একমাত্র পুত্র গাউসে জামান খলিফায়ে আযম পীরে কামেলে মোকাম্মেল দাদাজান কেবলা মুফতী আল্লামা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ফরহাদাবাদী (কঃ) ১৩৯৫ বাংলা ১৯৮৮ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। অতঃপর ইবনে ফরহাদাবাদী দাদাজান মুফতীয়ে আহলে সুন্নাত আল্লামা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ফরহাদাবাদী (কঃ) এর বেছালের পর ১৪০৭ বাংলা ২০০০ সালে ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত ধারাবাহিকতায় ১৪১৭ বাংলা ২০১০ সালে ফরহাদাবাদ দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন পীরে ত্বরিকত মুফতী আল্লামা সৈয়দ মোজাম্মেল হক শাহ ফরহাদাবাদী কর্তৃক এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর ৫ম সংস্করণ পুন:মুদ্রণ বিদ্যমান রয়েছে।

৪। আত্ তাওজিহাতুল বহিয়্যাহ ফি তারদীদে মা-ফিত্ তান্কিহাতিছ ছুন্নিয়াহ:

এই কিতাবটি হচ্ছে- "আত্ তান্কিহাতিছ ছুন্নিয়্যাহ ফি তাহরিমে সিজদাতুত্ তাহিয়্যাহ" নামক কিতাবের খন্ডনে ঐতিহাসিক লিখিত কিতাব। ফেনী জেলায় মাইজভান্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের সাথে সেমা ও সিজ্দায়ে তাহিয়্যা বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের এক মুনাজেরা (বাহাস) অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাইজভান্ডারী অনুসারীদের পক্ষে শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) নেতৃত্ব দান করেন ও সাথে ছিলেন তাঁর নাতি সম্পর্কীয় (মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (রাঃ) এর ছেলে)[১] মমতাজুল মোহাদ্দেসীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর মন্দাকিনী এম. এ পোস্ট মেডেলিষ্ট সাহেব। উক্ত মুনাজেরায় মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) সিজদায়ে তাহিয়্যা ও নির্দোষ সেমা মাহফিল সম্পর্কে "আত্ তানকিহাতুছ ছুন্নিয়া" নামক কিতাবের লেখকের যাবতীয় বাতিল মতবাদকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খন্ডন করেন এবং সফলভাবে বিজয় লাভ করেন। মুনাজেরাস্থল হতে আসার সময় "আত্ তানকিহাতুছ ছুন্নিয়া" নামক কিতাবের একটি কপি মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ)কে প্রদান করা হয়। অতঃপর আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিলাদি ও পূর্ববর্তী বুযুর্গানেদ্বীনের উক্তি ও কিতাবাদি হতে সংগ্রহ করতঃ "আত্ তানকিহাতুছ ছুন্নিয়া ফি তাহরিমে সিজদাতুত্ তাহিয়্যা" ও বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় অপব্যাখ্যা খন্ডন করে ঐতিহাসিক ফেনী মোনাজেরাকে ভিত্তি করে উচ্চাঙ্গ আরবী ভাষায় এক দুর্লভ গ্রন্থ "আত্ তাওজিহাতুল বাহিয়্যা ফি তারদীদে মাফিত্ তান্কিহাতুছ ছুন্নিয়া মা'আল কাওলিল মুগনি ফি রদ্দে মুনাজেরাতে ফেনী" রচনা করেন। যা দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য আলেমগণ তথা সুদূর মিশর জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। অতঃপর লেখক উক্ত কিতাবখানা ১৩৫৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। অতঃপর এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন লেখকের পুত্র পীরে কামেলে মোকাম্মেল গাউসে জামান সাজ্জাদানশীন মুফতী আল্লামা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম ফরহাদাবাদী (কঃ) ১৯৮৯ সালে।

উল্লেখ্য যে, গাউসে আমিন মুফতীয়ে আযম আল্লামা

ফরহাদাবাদী (কঃ) রচিত "তোহফাতুল আখ্ইয়ার" কিতাবখানিতে নির্দোষ সেমা ও সিজ্দায়ে তাহিয়্যা সম্পর্কে জায়েজ ও বৈধতার পক্ষে ফতোয়া প্রণীত হয়। তথাপিও কিছু জাহেরী জ্ঞান সম্পন্ন আলেম সিজদায়ে তাজিমী বা তাহিয়্যার বিরোধিতা করতঃ কুফরী, শিরক, হারাম ইত্যাদি লাগামহীন ফতোয়া দিতে থাকে। তাই মুফতীয়ে আযম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) সেমা ও সিজ্দায়ে তাহিয়্যা বিষয়ে নাজায়েজের পক্ষে আলেমদের অপব্যাখ্যা ও দলিল খন্ডন পূর্বক জায়েজ ও বৈধতার পক্ষে স্ব-নির্ভর ও বিশদ আলোচনা সহকারে "আত্ তাওজিহাতুল বাহিয়্যা ফী তারদিদে মা-ফিত্ তানকিহাতুছ ছুন্নিয়া" নামক ফত্ওয়ার কিতাবখানি রচনা করেন। যাতে পাঠক মহল সুস্পষ্ট ফয়সালা লাভ করে উপকৃত হতে পারেন।

৫। রাফিউল গেশাবী ফি তারদীদে মা-ফী ইশাআতিল ফাতাবী:

পবিত্র জুমার সালাতের পূর্বে ইমামের পক্ষ হতে খোত্বা প্রদান করা সুন্নাত। আর উক্ত খোত্বা আরবী ভাষায় পড়াটা শর্ত। কিন্তু আরবী খোত্বাকে অনারবী তথা নিজ নিজ অঞ্চলের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে উপস্থিত মুসল্লিদের জানিয়ে দেয়া আমল ও আকিদার ক্ষেত্রে অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুফতীয়ে আযম গাউসে আমিন আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) জুমার খোত্বা মাতৃভাষায় অনুবাদ করা প্রসঙ্গে এক ঐতিহাসিক ফত্ওয়ার কিতাব রচনা করেন। আর তার নাম হচ্ছে- "রাফিউল গেশাবী ফি তারদীদে মাফি ইশাআতিল ফাতাবী।" আর এই কিতাবখানি রচিত হয়েছে অনারবী তথা মাতৃভাষায় জুমার খোত্বা অনুবাদ করা নাজায়েজ সম্পর্কে মীরশ্বরাই থানার ছুফিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আবদুল গণি প্রকাশ আওয়াল শাহ (রঃ) কর্তৃক লিখিত কিতাব "ইশাআতিল ফাতাবীল হানাফীয়্যাহ ফী তাহরিমি খুত্বাতিল জুময়া বেগাইরিল আরাবিয়্যাহ" নামক কিতাবের রদ বা খন্ডনে। বাহরুল উলুম মুফতীয়ে আযম গাউছে আমিন আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) কর্তৃক লিখিত "রাফিউল গেশাবী ফি তারদীদে মা-ফী ইশাআতিল ফাতাবী" নামক কিতাবখানি তাঁর জীবদ্দশায় একবার প্রকাশিত হয়েছিল।

৬। গায়তুত্ তাহকীক ফী-মা ইয়াতায়াল্লাকু বিহি তালাকুত্ তা'লীক:

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কুঃ) রচিত "গায়তুত্ তাহকীক ফী মা ইয়াতায়াল্লাকু বিহি তালাকুত্ তায়লীক" নামক কিতাবখানা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কীয় একটি গ্রহণযোগ্য ফত্ওয়া। এতে তালাক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সুস্পষ্ট ফয়সালা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত কিতাবখানা লেখকের জীবদ্দশায় একবার প্রকাশিত হয়েছিল।

৭। মেরআতুল ফাল্লে ফি শরহে মোল্লা হাছান:

লেখনীর জগতে "মেরাতুল ফাল্লে ফি শরহে মোল্লা হাছান" হচ্ছে শাইখুল ইসলাম বাহরুল উলুম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) কর্তৃক রচিত এক ঐতিহাসিক কালজয়ী অবদান। এটা উসুলে ফেকাহ বা ইসলামী আইন ও তর্ক শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব "মোল্লা হাছান" এর পূর্ণাঙ্গ শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। "মোল্লা হাছান" নামক কিতাবখানি ইসলামী আইন ও তর্ক শাস্ত্রের উপর লিখিত জটিল, কঠিন ও সুক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। উক্ত কিতাবখানিকে মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) আরো গভীর ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে রূপদান করেন, "মেরাতুল ফাল্লে ফি শরহে মোল্লা হাছান।" যা ফেকাহ শাস্ত্রের বিরাট অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ৪১০ পৃষ্ঠা আল্লামা ফরহাদাবাদী (কঃ) এর মহা মূল্যবান কিতাবখানি ভাষা ব্যবহারে অপূর্ব রচনা শৈলী, অনুপম গ্রন্থণা ও শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এক অতুলনীয় কিতাব। যা ইসলামী আইনবিদ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদুবী (রঃ) রচিত বিখ্যাত উসুলে ফিকাহর কিতাব "উসুলে বাযদুবী" ইমাম নাসাফীর রচিত মাতান "আল্ মানার" এবং অন্যতম ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ও মানতেকী মোল্লা মুহিবুল্লাহ বিহারী (রঃ) রচিত "মুসাল্লামাছ ছাবুত" নামক গ্রন্থের ন্যায় উক্ত কিতাবখানিও অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, উচ্চাঙ্গ ভাব-বচন ও প্রশংসার দাবীদার।

শাইখুল ইসলাম মুফতীয়ে আযম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (কঃ) রচিত "মেরাতুল ফাল্লে ফি শরহে মোল্লা হাছান" গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান। যার মূল পান্ডুলিপি লেখকের আওলাদ দরবারের সাজ্জাদানশীন আল্লামা সৈয়দ মোজাম্মেল হক শাহ ফরহাদাবাদী (মঃ) এর নিকট অতি যত্নসহকারে সংরক্ষিত রয়েছে। ইন্শাআল্লাহ শীঘ্রই ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ বিশ্ব মাওলানা মঞ্জিল হতে উক্ত কিতাবখানি ও লেখকের অন্যান্য কিতাবাদি পাঠক মহলের খেদমতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের এই কাজে সহায় হউন। আগামী ২৭ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর বুধবার এই মহান হাস্তির ৬৯তম পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারক ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। তাই উক্ত ওরশ উপলক্ষে তাঁহার রূহানী ফয়ুজাত কামনা করি। আমিন।

(Footnotes)

১. মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী (রঃ) এর পীরে বাইয়াত ও উস্তাদ হচ্ছেন মুফতীয়ে আযম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ)

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ

• মোঃ মাহবুব উল আলম •

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ওফাতের প্রায় ৪১ বছর পর এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) ওফাতের প্রায় দশ বছর পর বৃটিশ-ভারতের পতন হয়ে তদানীন্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এ রাষ্ট্রের পত্তনের মূল ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনিও ছিলেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ভক্ত। তিনি বলতেন, "মাইজভাণ্ডার শরীফের ছায়া যতদিন আমার উপর থাকবে, ততোদিন কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী আমাদের এই অঞ্চল ঐ সময়েই স্বাধীন হবার কথা ছিল। সমকালীন বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব, প্রচুর মার-প্যাঁচ, জটিলতা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের রকমারী ওয়াদা ভঙ্গের কারণে সৃষ্ট নিদারুণ হানাহানিজনিত পরিস্থিতিতে ঐ সময়ে তা হয়ে উঠেনি। কংগ্রেস দল এবং এই দল থেকে নির্বাচিত ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্যরা (এম এল এ) প্রকাশ্যে সরাসরি ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং এর বিপরীতক্রমে মুসলিম লীগের এম এল এ-গণ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেন। এ ভোটাভুটিতে তদানীন্তন বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই অঞ্চল বৃটিশের কব্জা থেকে মুক্ত হলেও এক-পাকিস্তানের অবাঞ্ছনীয় কাঠামোয় আবদ্ধ হয়ে যায়। এ অঞ্চলের মানুষ এ অবস্থা মেনে নিতে পারেননি। তেমনিভাবে মেনে নিতে পারেননি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পৌত্র অসিয়ে গাউসুল আযম শাহ্‌সূফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীও (কঃ)। তিনিও ছিলেন লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের পক্ষে। তাঁর মুরীদ এবং বর্তমানে (২০০৮খ্রিঃ) মাইজভাণ্ডার শরীফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের এন্তেজামিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল আহমদ সিকদারের একাধিক প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে ফটিকছড়ি থানাধীন নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে "উত্তর চট্টগ্রাম প্লাবন নিবারণ সমিতির" তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিবসে পাকিস্তান প্রস্তাবের উপর আলোচনা সভায় তিনি এই বলে অংশগ্রহণ করেননি যে, 'এটা লাহোর প্রস্তাবের চেতনা ও দর্শনের বিরোধী; ফলে স্বাধীনতার ভিত্তি-প্রস্তাবেরও বিরোধী।' তবে কি পাকিস্তান হবে না-জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, 'অবশ্যই হবে-তবে সে দেশ পঁচিশ বছরের অধিক টিকবে না-টিকতে পারে না'।

এভাবে তদানীন্তন পাকিস্তানের উষালগ্ন থেকেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ নীতিগতভাবে এবং কার্যতঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ আধ্যাত্ম পরিমন্ডলে বাংলাদেশী আবহে বাঙ্গালী সংস্কৃতিরই প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৪৭ সনের বহু পূর্বেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) বিজ্ঞ অনুসারীরা এই দর্শন সম্পর্কে যে সব তাত্ত্বিক পুস্তকাদি রচনা করেন, তাতে তাঁরা এ অঞ্চলকে 'মূলকে বঙ্গাল' বা 'বাংলাদেশ' বলেই অভিহিত করেছিলেন। হযরত মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ) তাঁর পুস্তকে এদেশকে 'বাংলাদেশ' বলেই লিখেছিলেন। বহু মাইজভাণ্ডারী গীতিকার নিজেদের পরিচিতি মূলক রচনায় ও জন্মভূমির নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বাংলাদেশ শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। রাম-জন্মের আগেই রচিত হয়েছিল রামায়ন। তেমনি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্মত 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের' অভ্যুদয়ের বহু পূর্বেই 'বাংলাদেশ' শব্দটা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যেও লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পর পরই পূর্ব বাংলা থেকে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নের ধ্বনি ও দাবি উত্থাপিত হয় ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনকালীন সাবজেক্ট কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য (তদানীন্তন আসাম মুসলিম লীগ সভাপতি) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কণ্ঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালীন অতিসংকটময় ও গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে তদানীন্তন আসামের গোপীনাথ বরদলই সরকার তাঁকে কারাগারে আটকে রেখেছিল ঠুনকো অজুহাতে বিশেষ মতলবে। এ সময় তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা না হলে বাংলাদেশ অঞ্চলের ইতিহাস ঐ সময়েই ইঙ্গিত রূপ পরিগ্রহ করতো।

লাহোর প্রস্তাবের মর্মানুসারে আসামের বাঙ্গালী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ভুক্ত হবার কথা ছিল। পরে মাওলানা ভাসানী বহু কষ্ট ও সংগ্রামের বিনিময়ে সিলেটকে বাংলাদেশভুক্ত করতে সক্ষম হন। যাই হোক, ১৯৪৮ সনে পূর্ব বঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে তিনি শুরু থেকেই (১৯ মার্চ, ১৯৪৮) রাজনৈতিক দিগন্তে লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়নের আওয়াজ তোলেন। লক্ষ্যণীয় যে, একই সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে অসিয়ে গাউসুল আযম শাহ্‌সূফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কণ্ঠেও একই ধ্বনি শোনা যায়। এভাবে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা স্বাধীন

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম একই সঙ্গে শুরু হয়। জন্মগ্রহণ করে নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রবল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে গঠিত এ নতুন দলের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সেদিনের যুবক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান তখন 'বঙ্গবন্ধু' হননি। বাংলাদেশ অঞ্চলের নব পর্যায়ের আন্দোলনের এক স্তরে তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সংস্পর্শে আসেন। এ প্রসঙ্গে গাউসিয়া হক মঞ্জিলের জনাব জামাল আহমদ সিকদার নিবন্ধে লেখেন ঃ জেনারেল আয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তারেক আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য এন.জি. মাহমুদ কামাল, পাথরঘাটা রাজা মিয়া সওদাগরের নাতি এম.এ. গণি, আগ্রাবাদের সাবেক কমিশনার ফজলুল হক এবং ডবলমুরিং হতে নির্বাচিত প্রাক্তন এম,পি জনাব ইসহাক চেয়ারম্যানসহ তার জীপযোগে শেখ সাহেব আরো ক'বার মাইজভাণ্ডার শরীফ গমন করেন। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ), কুতুবুল আকতার হযরত মওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) রওজা শরীফ জেয়ারত করে দোয়া করেন। অতঃপর হুজুরা শরীফে বসে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য শেখ সাহেবকে পাঁচটি মূলনীতির পরামর্শ দেন। সেগুলো হলোঃ (১) প্রশাসনিক, সামরিক, বিচার বিভাগসহ সকল সরকারী অফিস আদালতে বাঙ্গালীর ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ। (২) আঞ্চলিক শোষণের অবসানের জন্য কার্যকরী অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুঁজে বের করা। (৩) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাহেতু জনগণের জানমালের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ। (৪) এসব দাবির পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য দেশের সর্বত্র সুষ্ঠু সাংগঠনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা। (৫) প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমতা ভিত্তিক ন্যায্য সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।' ...ছেষট্টি সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠকে শেখ সাহেব পেশ করেন ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব।

আসলে এই ছয় দফা ছিল আটান্ন সালে হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) নির্দেশিত নীতিমালার ফলিতরূপ।" [স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব প্রক্রিয়ার সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের যুগপৎ জাগতিক ও রুহানী সংশ্লিষ্টতার কিছু আপস আমরা উপরের তথ্য গুলো থেকে লাভ করেছি। এতে দেখা যায় যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) জমানা থেকে এ প্রক্রিয়া সূচিত এবং তা স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব কালেও অক্ষুণ্ন থাকে। গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানসীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.জি.আ.) বর্ণিত নিম্নোক্ত তথ্যেও এর নিদর্শন মিলে। হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.জি.আ.) তথ্য প্রকাশ করে বলেনঃ "১৯৫২ ও ৫৮ সালে দু'বার মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ জেয়ারতে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাভ করেন হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) দোয়া, দয়া ও পথ-নির্দেশ। ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, সত্তরের বিপুল নির্বাচনী বিজয় এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে মাইজভাণ্ডারী করুণাধারা গভীরভাবে জড়িত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) বার্ষিক ওরশে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে মাইজভাণ্ডার শরীফে আসবার অনুমতি দিয়ে উপরিউক্ত অলি-আল্লাহ্ বাঙ্গালীর বিজয়কে আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন এবং তাঁর নির্দেশিত

সময়সীমার মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঘটে। দরবারের নির্দেশে বিপুল মাইজভাণ্ডারী ভক্ত মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দরবারের আওলাদ ও নিকট আত্মীয়রাও ছিলেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, খাগড়াছড়ি জেলার মুয়ুরখিলস্থ দরবারের খামার, ফটিকছড়ি থানার খিরামের সৈয়দ লকিয়ত উল্লাহ খামার এবং দেশব্যাপী মাইজভাণ্ডারী খলিফাদের দরবার ও ভক্তদের বাসগৃহ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়, তথ্য কেন্দ্র ও ট্রানজিট ক্যাম্প। এজন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এসব কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে নির্যাতন, হত্যা এমন কি ধর্ষণও করেছে। এই দরবারের বহু ভক্ত-মুরিদ মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ্র সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ ছিল বলে এই দরবার বাঙ্গালীর ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে, স্বাধীনতার পক্ষে গৌরবময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।"

তথ্য সূত্রঃ মোঃ মাহবুব উল আলমঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, জামাল আহমদ সিকদারঃ ২০০৯

মাইজভাণ্ডারী করুণাধারা ঃ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি, মাসিক আলোকধারা।

ড. সেলিম জাহাঙ্গীরঃ মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন।

বিপন্ন মানবতা ঃ আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের শিক্ষা

• অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান •

মানবতা আজ বিপন্ন প্রায়। সারা বিশ্বে বিরাজ করছে চরম এক অস্থিরতা। কোথাও সামাজিক, কোথাও রাষ্ট্রীয়, কোথাও ধর্মীয় অস্থিরতা এবং কোথাও বা গোত্র ও বর্ণ বৈষম্যবাদের কারণে মানবতার বিপর্যয় ঘটছে মারাত্মক ভাবে। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পেশী শক্তির বহিঃ প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে বহু গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির আক্রোশের শিকার হচ্ছে বিশ্বের কোটি কোটি অসহায় হত দরিদ্র মানুষ। যুদ্ধ, বিগ্রহ, হানাহানি, রক্তপাত এবং পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন। অনাহারে, অবিচারে, অপুষ্টিতে এবং বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে মানুষ। গৃহহীন বস্ত্রহারা হয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। বিশ্বমানবতার চরম বিপর্যয়ের এ ছবি কী কারো নজরে পড়ছেনা ? অবশ্যই পড়ছে কিন্তু তাতে সাড়া দেয়ার কেউ নেই। আছে শুধু মুখের বুলি। এ ব্যাপারে পবিত্র ধর্ম ইসলাম কী বলে তা যদি গভীর ভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই যে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে কেবল মানবতাকে রক্ষা করার জন্য। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত মানবতার সেবা নিশ্চিত করার জন্য শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়কে অকৃত্রিম পবিত্র ভালবাসার ছায়াতলে এনেছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়াসাল্লাম)।

মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রথমতঃ আল্লাহর হক, যা ইবাদত বন্দেগী যথা সৎকাজ হিসাবে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বান্দার হক যা পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত। বান্দার হক সমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আর্তমানবতার সেবা। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম সার্বজনীন ও সর্বকালীন শাশ্বত এক ঐশী জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। সর্ববৃহৎ পরিমন্ডলে বান্দার হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন অনস্বীকার্য। ইসলাম মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণসাধনকারী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে সন্দেহের কোন প্রকার অবকাশ নেই। ইসলামের আইন-কানুনের সমৃদ্ধতা উপযোগিতা ও প্রয়োগিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং যে কোন পর্যায়ের আলোচনায় ইসলামী বিধানকে একমাত্র কল্যাণকারী বলা যায়। ইসলাম ইয়াতীম, মিসকীন তথা অনাথ ও গরীবদের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে একদিকে ধনীদের ধন সম্পদে তাদের হক নির্ধারণ করেছে এবং তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথাযথ বিতরণ পদ্ধতির সুষ্ঠু ব্যবস্থানা রেখেছে। অন্যদিকে তাদের প্রতি আচরণ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে অভাবিত হৃদ্যতাপূর্ণ দায়িত্বশীলতা প্রদর্শনের নীতিমালা ঘোষণা করেছে, ধনী ও ধনহীন অসহায়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ও দ্বন্দ্বের অবসান কল্পে কার্যকর ব্যবস্থাবলী প্রদান করেছে। গরীব ও ভিক্ষুকদের প্রতি মানুষের বিদ্যমান মনোভাব অপসারণের জন্য এতে রয়েছে বিশেষ সেই নির্দেশ যা অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে পাওয়া যাবেনা। ইতিহাস সাক্ষী যে, জাহেলী যুগের প্রথা ছিল এতিম ও অনাথদের প্রতি তিরস্কার, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ এবং তাদেরকে সর্বদিক থেকে চাপের মুখে রাখা। ভিক্ষুক, অভাবী ও মিসকীনদের প্রতিও মানুষকে সহানভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা এতে রয়েছে। কাফেরদের কঠোরতা ও মিসকীনদের প্রতি সাহায্য করতে অনীহার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা সূরা ফজরের ১৮ নং আয়াতে বলেছেন। সামাজিক সুবিচার, অধিকার, মূল্যবোধ, ধর্মীয়- অধিকার, নাগরিক, তথা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো সুবিন্যস্ত করা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সংস্কার সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। তাঁর প্রচারিত আদর্শের মূল কথা হচ্ছে শাসক- শাসিত, ধনী, নির্ধন, উঁচু-নীচু, মনিব-গোলাম, সাদা-কালো, সকলেই আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকলেরই রয়েছে সমান অধিকার।

হযরত রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী আদর্শের পয়গাম উপস্থাপন করেছেন যা মানুষের অন্তরকে মানব সমাজের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কেবল নয় বরং বাধা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার মূলবোধ ও আদর্শের গোলামী থেকে মুক্তি নিশ্চিত করেছে। তাই দাস প্রথা এখানে চলতে পারেনা। দাস প্রথা উচ্ছেদে তিনি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ধন সম্পদ আহরণ, ভোগ ও বন্টন সবকিছুতেই আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব রয়েছে। মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে পরস্পরতার সুমহান দর্শনের ভিত্তিতে

অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এখানে সকলেই শ্রম বিনিয়োগ করবে বৈধ উপায়ে, পূর্ণ শক্তি ও বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করে, কিন্তু তা কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য নয়, বরং ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের কল্যাণার্থে। ইসলাম ধন-সম্পদ থেকে যাকাত ফিতরা আদায়কে একটা অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসাবে অধিকার নিরূপন করে তা মানুষের উপর আইনগত আবেষ্টনীয় দ্বারা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করে দিয়েছে। যাকাত, ফিতরা, সাদকাহ গরীবদের জীবিকার নূন্যতম চাহিদা পূরণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা ফকীর, মিসকীন, আত্মীয়স্বজন, অনাথ গরীবদের জন্য ব্যয় করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়ের মাধ্যমে অন্যদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা, সমবেদনা প্রকাশ, প্রতিবেশি, দীন-দু:খীদের ও অসহায়দের সাহায্য প্রভৃতি সম্পর্কে ইসলাম সঠিক ও উত্তম নির্দেশনা দিয়েছে। পীড়িতের সেবায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এক ইহুদি তাঁর গৃহে মেহমান হয়ে পেটের অসুখজনিত কারণে পায়খানা করে সারা ঘর ভরে দিলে তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। এমন নজির বিশ্বে বিরল নয় কি? কোন ভাল কাজের আদেশ করা, পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা, অন্ধকে পথ চলতে সাহায্য করা , মানুষের চলার পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে ফেলা প্রভৃতি এক একটি ছদকা যা পূণ্যের কাজ বলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সেবাতে পূণ্য হাসিল হয়," এ সম্পর্কে হযরত রাসুল করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আর্তমানবতার সেবায় অংশ হিসাবে প্রতিবেশির উপর হক সম্বলিত উপদেশমূলক ঐতিহাসিক বাণীটি উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন-

"যদি সে সাহায্য চায়, তাকে সাহায্য কর;
যদি সে আশ্বাস চায়, তাকে আশ্বাস দাও;
যদি ঋণ চায়, তাকে ঋণ দাও;
অভাবগ্রস্ত হলে তার অভাব দূর কর;
যদি পীড়িত হয়, তাকে সেবা কর;
মৃত্যু হলে তার দাফন সম্পন্ন কর;
যদি তার মঙ্গল হয়, তাকে আনন্দদান কর;
বিপদে পড়লে, সহানুভূতি প্রদর্শন কর
তার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার ঘর বা ইমারত উঁচু করোনা; কারণ এতে তার ঘরের আলো-বাতাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে;
যদি তুমি ফল ক্রয় কর তাকে কিয়দাংশ দান কর।"

অতএব, আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের শিক্ষা সমাজে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে এবং সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের শিক্ষা গ্রহণের তৌফিক দান করুন।

সূফি উদ্ধৃতি

- তাওয়াক্কুল কখনও উপার্জনের বিরোধী নহে; বরং উপার্জন এবং তাওয়াক্কুল উভয়ই ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

- কেহ যদি এই উদ্দেশ্যে আবশ্যকের অতিরিক্ত উপার্জন করে যে, পীড়িত ও অকর্মন্য হইয়া পড়িলে তদবস্থায় সেই অতিরিক্ত উপার্জন ব্যয় করিবে, কিংবা মরিয়া গেলে তদ্বারা দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহ হইবে, তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

- দুনিয়ার লোকে যাহার খুবই বেশি কদর ও সম্মান করে, তাহার কর্তব্য নিজেকে নিজে খুব অপদার্থ ও তুচ্ছ মনে করা। যাহার ফলে আত্মগরিমা হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে।

- ঐশ্বর্যশালী লোকদের নিকট বড়াই করা আর গরীব মিসকীনদের নিকট নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করাই সত্যিকারের নম্রতা।

– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রঃ)

"মাহে সফর এর গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আমল"

• সৈয়দ আবু আহমদ •

'সফর' আরবী হিজরী সনের দ্বিতীয় মাস। ইসলামের ইতিহাসে এ মাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ ও আমলীয়। ইসলামের ইতিহাসে বহু ঘটনা এ মাসে সংঘটিত হয়েছে বলে বর্ননা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত রকম বিপদ-আপদ ও বালা-মছিবত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে তার অধিকাংশেই এই সফর মাসে ঘটে। এজন্য এ মাসকে 'মাহে নুযুলে বালা' বা বালা মছিবত অবতীর্ণ হওয়ার মাসও বলে থাকে।

'সফর' মাসে অনেক সম্মানিত নবী-রাসূল নবুয়তের পরীক্ষামূলক মছিবতের সম্মুখীন হয়েছেন যা খুবই প্রসিদ্ধ। যেমন- হযরত আদম (আঃ) এর জান্নাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ, হযরত আইয়ুব (আঃ) এর কঠিন বালায় পতিত হওয়া, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের উদরস্থ হওয়া, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)'র উপর লোবাইদ ইবনে আছম ও তার পুত্রদের কৃত যাদুর বাহ্যিক প্রভাব থেকে আরোগ্য লাভের মত বহু ঘটনা ঘটেছে এ মাহে সফরে।

জুমআর খুত্‌বায় 'সফর' মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনায় এসেছে– যুগ ও মাসের বিবর্তন কালে আপনারা প্রস্তুতি নিন জাগ্রত হোন। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদেরকে মুহর্‌রম মাস থেকে সফর এর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর এটাই হচ্ছে প্রস্থান ও সফরের নিদর্শন। মাসগুলো সফর কালে মুসাফিরের মঞ্জিল সদৃশ। সুতরাং প্রস্থানের পূর্বেই পাথেয় সংগ্রহ করে নিন। যৌবনকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করুন। কারণ যৌবন যখন ফুরিয়ে যাবে তখন একে বেঁধে রাখা যাবে না। বার্ধক্য আপনাদেরকে মৃত্যুর আগমন সংবাদ দিচ্ছে, মৃত্যু সন্নিকটে।

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة

অর্থাৎ- তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ় কিল্লায় বাস কর। (সূরা নিসা, ৩৮)

প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন- 'তোমরা যে মৃত্যুর কথা জান, যদি চতুষ্পদ জন্তু তা জানত তবে তোমরা কোন মোটা তাজা প্রাণী খেতে পেতে না।

তিনি আরো বলেন- 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম কাঁদতে অধিক।' (আল হাদীস) (খুৎবাহ দোয়াজদা মাহী কৃত আল্লামা ইবনে নাবাতা)।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন-

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আগামী দিনের জন্য কি সম্বল পাঠিয়েছে তা যেন প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। (সূরা হাশর ১৮)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 'কিয়ামতের দিন ঘর্মাক্ত কলেবরের ঘাম মাটিতে বয়ে সত্তর হাত পর্যন্ত চলে যাবে। ঐ ঘাম তাদের মুখমন্ডল ও কর্ণ পর্যন্ত পৌছে যাবে।'

তিনি আরো বলেন- 'যতদিন বেঁচে থাকার ভালভাবে বেঁচে থাক, কারণ তুমি মরণশীল, যাকে ভালবাসার ভালবাস কারণ তুমি তাদের থেকে বিদায় নিচ্ছ, আর যা কিছু করার করে যাও কারণ তুমি এর প্রতি দান পাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমাদের সবাইকে তাঁর হেদায়াতের পথে চলার তৌফিক দান করুন। (আল হাদিস) (খুৎবায়ে দোয়াজদা মাহী কৃত আল্লামা ইবনে নাবাতা)।

পরিশেষে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

অর্থাৎ- হে নবী ! আপনি এ কথা বলে দিন, হে আমার ঐ সব বান্দারা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রকার গুনাহ মাফ করে দেবেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা যুমার, ৫৩)

বালা-মুসিবত ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এ ধরণের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য কুরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানেদ্বীনগণ নফল নামায, দরুদ, এস্তেগফার, অজিফা ও বিভিন্ন ধরণের দোয়া দ্বারা মু'মিনদেরকে বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন। আমাদের উচিত এ সফর মাসে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও বালা-মুসিবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য বেশি বেশি, নফল নামায, নফল রোযা ও ইবাদতে মনোনিবেশ করা।

বছরে দশ লাখ আশি হাজার বালা-মুসিবত নাযিল হয়। তন্মধ্যে নয় লাখ বিশ হাজার শুধু সফর মাসে নাযিল হয়। (রাহাতিল কুলুব)।

সফর মাসের নফল ইবাদতঃ এ মাসের প্রথম তারিখে মাগরিব

নামাযের পরে ও এশার নামাযের পূর্বে চার রাকাআত নফল নামাযের প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে নামায আদায় শেষে নিম্নের দোয়াটি তথা দরুদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করবে-

اللّٰهم صل علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک النبی الامی والہ وسلم

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদিন আবদিকা ওয়া হাবিবিকান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

উক্ত দরুদ শরীফটি পাঠ করলে তার অতীত জীবনের সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং সে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)'র দীদার লাভে ধন্য হবে। (গুলজারে শরীয়ত ২৬১ পৃষ্ঠা)।

হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী (রাঃ) হযরত মোয়াজ বিন জবল (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি চাহার শোম্বা দিনে চাশ্‌তের সময় বার রাকাআত নামায এইভাবেই পড়বে যে, প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর একবার আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস তিনবার, মুয়াওয়েজ (আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাজীম) তিন বার পড়বে, তার জন্য একজন ফেরেশ্‌তা যিনি আরশে আজীম এর পাশে থাকেন, তিনি ডান হাত দিয়ে বলবেন- হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ আজ তোমার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে, আজ থেকে নতুন কাজ আরম্ভ কর। আল্লাহ্‌তায়ালা তার থেকে কবরের শাস্তি, কবরের অন্ধকার দূরীভূত করে দেন। এবং তার থেকে কিয়ামতের সমস্ত মুসিবত উঠিয়ে নেবেন। এই বান্দার আমল নবীদের আমলের মত করে কিয়ামতে তাকে উঠাবেন। সুবহানাল্লাহ্! (গুনিয়াতুত্ তোয়ালেবীন, পৃষ্ঠা ৫৬৪)।

আখেরী চাহার শোম্বা তথা শেষ বুধবার এর তাৎপর্য ও আমলঃ

'সফর' মাসের শেষ বুধবারকে ফার্সীতে আখেরী চাহার শোম্বা বলা হয়। এদিন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) রোগ হতে মুক্তি তথা আরোগ্য লাভ করেন। মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ইহুদীগণ কর্তৃক যাদু করা হয়েছিল এবং তার প্রভাব বাহ্যিক দেহ মোবারকে ক্রিয়াশীল হওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর হাবীবকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। অতপর সফর মাসের শেষ বুধবার ফজরের নামাজের পর গোসল করে সুস্থ বোধ করেন। তাই আমরা উম্মতে মুহাম্মদীরাও এ দিনকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করা অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। পুরো বছর বালা-মুসিবত, রোগ-শোক ও যাদু-টোনা থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাইতে এ আমল অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে আউলিয়ায়ে কেরাম ও আলেমেদ্বীনগণের দ্বারা প্রমাণিত।

এ আমল 'সফর' এর শেষ বুধবার সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করা উত্তম। এরপর সূর্যোদয়ের পর চাশ্‌ত এর নামাযান্তে দুই রাকাত নফল নামায পড়া খুবই সওয়াবের কাজ। এর পর যে প্রার্থনা করা হয় তা আল্লাহ্‌তায়ালা কবুল করেন বলে আউলিয়ায়ে কেরাম ও আলেমেদ্বীন মত প্রকাশ করেছেন। (রাহাতিল কুলুব কৃত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া)।

নিম্নে আয়াতে সালামসমূহ প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর পাঠ করে সিনায় ফুঁক দিলে এবং কলাপাতা বা সাদা কাগজে লিখে তা পানীয় জলে ভিজিয়ে পানি পান করলে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগ থেকে অবশ্যই মুক্তি বা আরোগ্য লাভ করা যায়।

আয়াতে সালাম

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم' سلام قولاً من رّبّ الرّحيم ' سلام علیٰ نوح فی العالمين سلام علیٰ ابراهيم' سلام علیٰ موسیٰ وهارون' سلام علیٰ الياسين' سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين' سلام هی حتّٰی مطلع الفجر

এ দিন গোসল করলে আল্লাহ্‌র রহমতে বালা-মুসিবত, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ ও নিরাপদ থাকবেন। গোসল করার নিয়ম হচ্ছে একটি পবিত্র ও পরিষ্কার পাত্রে নিম্নের দোয়া ও নক্সাটি কলা পাতা বা সাদা কাগজে লিখে পাত্রের পানিতে ভিজিয়ে পুকুরে কোমর সমান পানিতে নেমে মাথার উপর ঢালবেন। উল্লেখ্য যে, যারা বাথরুমে গোসল করেন তারা বড় বালতির পানিতে বসে মাথার উপর ঢালবেন যাতে পায়ে না লাগে।

দোয়া ও নক্সা

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم' انّ اللّٰه يمسک السّمٰوٰت والارض ان تزولا و لئن زلتا ان امسکهما من احد من بعده انّه کان حليما غفورا

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

সূত্রঃ

১. আল-কুরআন শরীফ।
২. আল-হাদীস শরীফ।
৩. জাওয়াহেরে কুনুজ ৫ম খন্ড, ৬১৬ পৃষ্ঠা।
৪. মজমুয়ায়ে ফতওয়া কৃত- আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী।
৫. তাযকিরাতুল আওরাদ।
৬. আনওয়ারুল আউলিয়া।

আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়

• অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী •

বেলায়ত, সুফিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত ইতিহাস ভিত্তিক গ্রন্থ "ছিয়ারুল আউলিয়া" যা ১৩০২ ইংরেজী সন থেকে ১৩২০ ইংরেজী সন পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিরচিত। কিতাবটি রচনার সূত্রপাত করেন–শায়খুশ শুয়ুখিল আলম, সুলতানুল মশায়েখ, মাহবুবে ইলাহী, হযরত খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া ক্বাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ। পরবর্তীতে তার পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করেন তাঁরই মুরিদ পরিবারের সদস্য বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মণীষী হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক মুহাম্মদ উলুবী আল কিরমানী (রহঃ) যিনি "আমীরে খুর্দ" নামে সমধিক পরিচিত। মূল ফার্সী ভাষায় রচিত এ অমূল্য গ্রন্থখানা অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মাহবুবে ইলাহী খাজা নিজাম উদ্দীন (কঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিবৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া চিশ্‌তিয়া পরিবারের অপরাপর মণীষীদের সম্পর্কে তথ্যাদিও সন্নিবেশিত হয়েছে। ৫৫০ পৃষ্ঠা কলেবরের উক্ত গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ বাংলা ভাষান্তর ও ভাব সম্প্রসারণ করতঃ বিশিষ্ট লিখক ও মাইজভাণ্ডারী গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী উপর্যুক্ত শিরোনামে পর্বে পর্বে প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছেন। ক্ষেত্রবিশেষে অনূদিত অংশের পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ যুগের দ্বিতীয় অতুলনীয় শায়ের বা কবি ছিলেন হযরত আমীর হাসান সঞ্জরি (রহঃ)। তিনি কবিতা ও গদ্যের প্রতি সীমাহীন আকৃষ্ট ছিলেন। বাক্য গঠন প্রণালীর প্রাঞ্জলতা এবং কথা বলার বাগ্মীতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনেক গুলো জ্ঞাত হওয়া গজল-কবিতা খুবই প্রাঞ্জল ভাবে পরিবেশন করেছেন। তিনি সাদী-এ-হিন্দ এর খিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (অর্থাৎ- ইরানী কবি শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদী সিরাজী (রহঃ) এর মতো কাব্যে পারদর্শী হওয়ার পেক্ষিতে তাকে হিন্দুস্থানের কবি শেখ সাদী নামে উপাধি দেয়া হয়েছে। এটি একটি এতদঞ্চলের অতীব গৌরবের বিষয় - সিরাজী) তিনি খুবই পছন্দনীয় চরিত্র ও গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন।

আমি (গ্রন্থকার) দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই দুইজন বন্ধুর একসঙ্গে উপবেশনকারী ছিলাম। পরস্পরের মধ্যে এমন ভালবাসা ও আন্তরিকতা ছিল যে, না তিনি আমাকে ছাড়া থাকতে পারতেন, না আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারতাম। অতএব আমীর হাছান হযরত সুলতানুল মশায়েখের বড়ই পাকা বিশ্বাসী ছিলেন। একারণে যা কিছু তিনি সুলতানুল মশায়েখের নিকট থেকে শুনতেন তা সমুদয় লিপিবদ্ধ করে যেতেন। শেষ পর্যন্ত ঐ সমগ্র মলফুজাত বা মুখ নিঃসৃত বাণীগুলোকে একত্রিত করে তার নাম রাখলেন (ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ) যে গ্রন্থটি আজকাল (তৎকালিন সময়ে) সত্যিকার মুরীদগণের জন্য কর্মপদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত ছিল। আমীর হাসান কবির একটি দিওয়ান বা কাব্যগ্রন্থও ছিল। গদ্যের ছোট ছোট রিসালা বা পুস্তিকা এবং মুসনবী দ্বীপদী ছন্দকারের কবিতা অনেক বিদ্যামান আছে। তিনি শরীফ মজলিস বা সভাকে মধুময়কারী ব্যক্তি ছিলেন তিনি ছিলেন কৌতুক সম্রাট, সূক্ষ্মভাষী, সদাচারী, শিষ্টাচারী, ভদ্র ও কৃষ্টিমনা, আমি (গ্রন্থকার) তার সান্নিধ্যে বসে তার কাছ থেকে যে ধরণের আরাম-শান্তি ও মমতা লাভ করেছি, অনুরূপ অপর কারো মজলিসে সেখান থেকে তা আমার নসীব হয়নি।

উপরোক্ত সমুদয় কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো যে, সুলতান আলাউদ্দীন এর অন্তরের পাষণ্ডতা দেখুন যে, হাজার হাজার ক্রোশ দূরত্ব থেকে আশেক-ভক্ত জায়েরীন লোক হযরত সুলতানুল মশায়েখ নিজাম উদ্দীন মাহবুবে ইলাহী কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আজীজ এর জিয়ারত বা সাক্ষাতের জন্য আগমন করতেন। কিন্তু আলাউদ্দীন বাদশাহর অন্তরে এ ধরণের কোন ধারণাই কোন সময়ে আসলনা যে, আমিও গিয়ে একটু উনার সাথে সাক্ষাৎ করে আসব। অথবা তাঁকে আমার নিকট আমন্ত্রণ জানাবো। বরং তার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা এক আশ্চর্য ধরণের করে তৈরী করেছেন। অথচ আমীর খসরু যিনি যুগের অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন, যদি তিনি সুলতান মাহমুদ অথবা সুলতান সঞ্জর এর শাসনামলে বিদ্যমান থাকতেন তাহলে তার অশেষ তাজীম-তাকরীম বা শ্রদ্ধা সম্মান করা হতো। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন শুধুমাত্র এক হাজার রুপিয়া-টাকা দিলেন। এতদভিন্ন তিনি অন্য কোন ধরণের তাজিম-তকরীম করলেন না। এ সমস্ত বিরল বস্তু তার ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজী ও লোক দেখানো কাজ ছিল।

সুলতান আলাউদ্দীনের অত্যধিক পানি পানের রোগ হয়েছিল যেটাকে আরবী ভাষায় বলা হয় (ইস্‌তিস্‌কা) রোগ। ঐ রোগের কারণেই তিনি রাজত্ব ও ধরাধাম ত্যাগ করলেন। তিনি বিশ

বৎসর সুলতানী বা রাজত্ব করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, বাদশাহের রুগ্ন অবস্থায় তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিটি বাদশাহের কাজ সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন (অর্থাৎ- দুরভিসন্ধী পূর্বক তাকে কৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন- সিরাজী)। ৭১৫ হিজরী সনের ৬ই শাওয়াল রাত্রিতে কোশাক মিরী থেকে সুলতান আলাউদ্দীনকে বের করা হয়েছিল এবং জামে মসজিদের পাশে তাদের পৈত্রিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। ঐ বৎসর আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবউদ্দীন রাজ সিংহাসনে আরোহন করলেন। বাদশাহর ওফাতের ৩৫ দিন পর বাদশাহের নায়েব মালিক বা উপ রাষ্ট্রপতিকে কতল করে দেয়া হলো। ৭১৮ হিজরী সনে দেওগীর নামক অঞ্চলবাসী রাজদ্রোহী হয়ে গেল। এটা ঐ অঞ্চল যা উপ-রাষ্ট্রপতি জয় করেছিলেন। এটা ঐ বিজিত অঞ্চল যে কারণে সুলতান আলাউদ্দীন মালিক নায়েব বা উপ-রাষ্ট্রপতির খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন। যেভাবে আলাউদ্দীন মালিক নায়েবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, অনুরূপ সুলতান কুতুবউদ্দীন খসরুখান এর উপর আসক্ত ছিলেন। খসরুখান যিনি এক নিম্ন বংশের হিন্দু ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে কুতুব উদ্দীন তার সেনাবাহিনীর প্রধান করেছিলেন তার হাতে বাদশাহ পরিবারের যত ধরণের দুঃখ-কষ্ট পৌঁছেছে তা থেকে বেঁচে থাকার কামনা করি খোদার দরবারে। কেননা ঐ কমজাতের সেনা প্রধান তার মুনীব/গুরুকে হত্যা করেছিল। তার গুরু বাদশাহর বান্দাদের শিশু-কিশোরদেরকে হত্যা করানো হলো। ঐ সকল মুসিবত-দুর্যোগের কারণ ছিল ঐ শত্রুতা যা সুলতান কুতুবউদ্দীন এর নিকট কুতুবে আলম সুলতানুল মশায়েখ নিজামউদ্দীন মাহবুবে ইলাহী কাদ্দাছাল্লাহু ছিররাহুল আজীজ এর সাথে ছিল।

শত্রুতার কারণ ছিল এটা যে, তিনি খিজির খান কে সুলতানুল মশায়েখের মুরীদ বলে জানতেন। এ কারণে তিনি সুলতানুল মশায়েখকে ভালমন্দ-গালাগাল দেয়া আরম্ভ করলেন। সুলতানুল মশায়েখকে কষ্ট দেয়ার জন্য উদ্যত হলো। সুলতানের কিছু দুশ্চরিত্র সঙ্গী-সাথী যারা তার দৃশ্যতঃ হিতাকাঙ্খী বলে প্রকাশ করত, তারা বাদশাহ এবং সুলতানুল মশায়েখের মধ্যকার শত্রুতার উপলক্ষ হয়ে গেল। সুতরাং তার রাজত্বের পতন সন্নিকট ছিলো। একারণে তিনি সুলতানুল মশায়েখের দুর্নাম ও তিরস্কার করা আরম্ভ করলেন।

আর সকল আমীর-উজীর এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন যে, কেউ যেন সুলতানুল মশায়েখের জিয়ারত করতে না যায়। আর বারংবার একথা বলতে ছিলেন যে, যে ব্যক্তি শাইখ (হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আওলিয়ার)'র মস্তক নিয়ে আসতে পারবে আমি তাকে হাজার রুপিয়া-টাকা পুরস্কার দিব। (সে সময় থেকে বোধ হয় সূফি দরবেশ ওলী-আওলিয়াদের প্রতি ঘৃণা পোষণের কু-প্রথার সূচনা হয়। যার সূতিকাগার হলো রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যালয়। পরবর্তী কালে যে সব সরকার প্রধান সূফি-দরবেশদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে তার সমুদয় পাপাংশ প্রথম কুখ্যাত ঐ শাসকের ঘাড়ে বর্তাবে - সিরাজী)

একদা শেখ জিয়াউদ্দীন এর কবর শরীফের স্থানে হযরত সুলতানুল মশায়েখের সাথে বাদশাহর সাক্ষাতের সুযোগ এলো। তখন বাদশাহ সুলতানুল মশায়েখের সাথে দেখা করলেন না। শেখ সাহেব (ক.) সালাম দিলেন বটে বাদশাহ তার জবাব পর্যন্ত দিলেন না। শেখ নিজাম (ক.) এর সাথে ঝগড়া করার প্রতি মনোনিবেশও করলেন না। অর্থাৎ: বিবাদে লিপ্ত হবার ভাবনাও করলেন না- সিরাজী) শেখ জাদাহ হিসাম যিনি সুলতানুল মশায়েখের বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন তাকে বাদশাহ আপন নৈকট্যে এনে দরবারে অন্তরঙ্গ করে নিলেন। (হিসাম হলেন হযরত শেখ জিয়াউদ্দীন (ক.) এর এক সন্তান যিনি সুলতানুল মশায়েখ এর অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন, হয়তঃ বা ক্ষমতার লোভে, নয়ত বা পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে - সিরাজী) শায়খুল ইসলাম রুকুনউদ্দীনকে মুলতান থেকে ডেকে নিলেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান কুতুবউদ্দীনকে চার বৎসর পর খসরুখান একটি দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাজার ছতুন মহলের মধ্যে কতল করে দিলেন। (হাজার ছতুন অর্থ হলো একহাজার পিলার বা থাম বিশিষ্ট মহল সেখানে সুলতান কুতুবউদ্দীনকে হত্যা করা হয়েছে। বস্তুতঃ খাজা নিজাম সুলতানুল মশায়েখের সাথে বিদ্বেষ ও প্রাণঘাতি শত্রুতার কারণে বাদশাহের এটাই হলো মারাত্মক নির্মম পরিণতি। আওলিয়ায়ে কেরামের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে বা শত্রুতা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক হাদিছে কুদছী শরীফে ইরশাদ করেন যে, যে আমার ওলী-আওলিয়াদের প্রতি শত্রুতা করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। এরই ফলশ্রুতিতে বাদশাহ কুতুবউদ্দীনের এই পরিণাম। তাই শাসক গোষ্ঠির জন্য এটা একটা শিক্ষণীয় ঘটনা - সিরাজী)

সুলতান কুতব উদ্দীনকে হত্যা করার পর তার লাশকে মহলের ছাদের উপর থেকে জঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল। যে ঘটনা দেখে লোকজন প্রাণের ভয়ে সরে গেল। সেখানে বাদশাহকে যে হত্যা করেছিল তাকেও হত্যা করে দেয়া হয়। ঐ রাত্রিতে অর্ধরাতের সময় বাদশাহ আইনুল মুলক মুলতানী, বাদশাহ মালিক ওয়াহিদুদ্দীন কোরাইশী এবং বাদশাহ মালিক ফখরউদ্দীন জুনা অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলুক শাহ প্রমুখদেরকে ডেকে হাজার ছতুন মহলের ছাদের উপর নিরাপদ স্থানে রাখা

হলো। যখন দিন আসল তখন খসরুখান আপন উজীর মন্ত্রীকে নাসিরউদ্দীন খিতাবে ভূষিত করলেন। আর নিজকে নিজে খানে খানান ঘোষণা করলেন। এবং প্রত্যেক মালিক বা বাদশাহকে নব নব খিতাব বা উপাধি দিয়ে এক একটি পদবী দান করলেন। তিনি কাউকে ভয় করলেন না। তার যদিও কোন ভয় ছিল তা ছিল গাজীয়ে মুলুক অর্থাৎ তুগলুক শাহর ভয়। (তাকেই শুধু ভয় করছিলেন, অন্য কাউকে নয় - সিরাজী) তুগলুক শাহ থাকতেন দ্বীপাল পুরে। যখন ঐ তুগলুক শাহ্ এই সংবাদ শুনলেন তখন খুবই অনুতপ্ত হলেন; অনুশোচনা করলেন। কেননা সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক এর উছিলায় তিনি সুলতান কুতুবউদ্দীনের নৈকট্য লাভ করেছিলেন। নিজের অনুগ্রহ কর্তার পক্ষ হতে উক্ত ঘটনায় তিনি খুবই ব্যথিত ও বেদনাগ্রস্ত হয়ে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও নিঃশ্বাস ফেলছিলেন না (অর্থাৎ টুঁ শব্দ ও করেননি - সিরাজী) তুগলুক শাহ্ সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিল্লী আক্রমন করল। আর খসরু খানকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করল। খসরুখান পরাজিত হয়ে পলায়ন করল।

দ্বিতীয় দিবসে তাকে গ্রেপ্তার করে কতল করে দেয়া হলো। খসরু খান মাত্র চারমাস রাজত্ব করেছেন। ৭২০ হিজরী সনে সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুগলুক শাহ কোশাকমিরী এর মধ্যে অবস্থান করলেন এবং বাদশাহী বা রাজ কার্যক্রম তার মুবারক জাত বা পবিত্র স্বত্তার মাধ্যমে সৌন্দর্যতা প্রাপ্ত হলো। ৭২৫ হিজরী সনে তুগলুকশাহ ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। আর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলুক শাহ যিনি পরবর্তী বাদশাহ ছিলেন তিনি তখতে আরোহন করেন। তার রাজত্বকালে ইসলামী রাষ্ট্র সমূহ খুবই উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়েছিল। যখন সুলতান মাহমুদ শুনলেন যে, তুগলুক শাহ লৌক্ষ থেকে আজ তুগলুক আবাদ পৌছবেন, তখন হুকুম দিলেন যে, তুগলুক আবাদ থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে আফগান পুরে একটি প্রাসাদ নির্মান করা হবে।

যে স্থানে তার পিতা রাত্রিযাপন করবেন আর সকালে বাদশাহী আরোহী-সত্তয়ারীর সাথে শহরে প্রবেশ করবেন। তুগলুক শাহ অন্যান্যদের নামাজের সময় ঐ নূতন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তার পুত্রকে সমগ্র অভিজাত-সম্মানিত ও সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তিবর্গকে স্বাগতম জানানোর জন্য প্রেরণ করলেন। যখন তিনি আগত অভ্যাগতদের কদমবুচী গ্রহণ করলেন তখন দস্তরখানা বিছানো হলো। পানাহারের ব্যবস্থা হলো। যখন ভোজপর্ব শেষে আমীর-উমরা এবং শাহজাদাগণ হস্ত ধৌত করার জন্য বাইরে বেরুল তখন আকাশ থেকে বিজলী ও বজ্রপাত হতে লাগল। যে বজ্রাঘাতে প্রাসাদের ছাদের উপর অবস্থানরত তুগলুকশাহ অপর পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে সকলেই মৃত্যুবরণ করল। সুলতান মুহাম্মদ শাহী তখতে আরোহণ করলেন এবং ২৭ বৎসর রাজত্ব করলেন। তিনি সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত থাকতেন। এমতাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগ যখন দীর্ঘস্থায়ী হলো তখন সিন্ধু নদের তীরে টঠ নামক স্থানে গেলেন সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেনাবাহিনীর মধ্যে বড় ধরণের হৈচৈ পড়ে গেল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা সন্নিকট হলো। অতঃপর ৭৫২ হিজরীসনে ফিরোজ শাহকে সর্বস্তরের জন সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিংহাসনে বসালেন।

স্মর্তব্য যে, শেখ নাছির উদ্দীন মাহমুদ, ওলামা-মশায়েখ, আমীর-উমরা, উজীর-ওজারা, নেতৃবন্দ, এবং সকল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে ফিরোজশাহকে বলতে লাগলেন যে, আপনিই ওলী আহাদ বা হবু সম্রাট। সুলতান মাহমুদের অসী/ওয়ালী বা অন্তিম বাণী দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হলেন আপনি। তার ভাইপো ও ছিলেন আর সুলতান মাহমুদের কোন পুত্র সন্তান ছিলোনা। সুতরাং ফিরোজ শাহ্ ব্যতীত এমন কোন সৈন্য বা রাজকীয় ব্যক্তি নেই যিনি এ দুঃসময়ে রাজত্ব-সুলতানাতকে সামাল দিতে পারে। একারণে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর সৃষ্টির বাগডোর আপনার হাতে নিয়ে নেন। রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সেনা বাহিনীকে মোগলদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

ফিরোজ শাহ বিভিন্ন ধরণের অজুহাত ও অপারগতা প্রকাশ করলেন, দায়িত্ব মুক্ত হতে চাইলেন। কিন্তু সমবেত জনতা ঐক্য বদ্ধভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, রাজ সিংহাসনে আরোহণের জন্য ফিরোজশাহ এর চাইতে অধিক উপযুক্ত ও যোগ্যতম আর কোন ব্যক্তি নেই। যদি তিনি এখন তখ্ত নশীন বা সিংহাসনে না বসেন আর একথা যদি মোঘলদের জানা হয়ে যায় যে, সিংহাসন এখন শূন্য এবং ফিরোজশাহ বাদশাহ হন নি; তখন আমরা সবাই মোঘলদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাব। এ কথা শুনে ফিরোজশাহ বাধ্য হয়ে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করলেন আর তখন লোকজন দুশ্চিন্তা মুক্ত ও শ্রম দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেন। ফিরোজ শাহের ওফাতের তারিখ হলো ৭৮৯ হিজরীসন। যে সনটি তার নাম ফিরোজ শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। (যা কাল গণনার পদ্ধতি অনুসরণ করে আরবী অক্ষরের নির্ধারিত সংখ্যা থেকে হিসেব করে বের করা সম্ভব। এটাকে আবজাদ হিসাবও বলা হয়। তাবিজ কবজ লিখার সময় যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয় সেগুলোও আবজাদ হিসেবের অন্তর্ভূক্ত। আরবীতে এক বিশেষ গণনার মাধ্যমে এসব সন তারিখ বের করা হয়ে থাকে। প্রাচীন কালে সরাসরি সংখ্যা না লিখে সন তারিখের ক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতো, যেখান থেকে জ্ঞানী গুণীরা অনায়াসে সংখ্যা বের করতে পারতেন। বর্তমান কালে ঐ পদ্ধতি প্রায় বিলুপ্তির পথে- সিরাজী) ফিরোজশাহ ৩৭ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব

আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ'

মূলঃ

যুগের মনসূর, প্রেমাস্পদের নূরী আননের প্রেমবিভোর, শরীয়তের মহাজ্ঞানী, মারফতের বিজ্ঞানী, ত্বরিকত বিদ্যার পরিবেষ্টনকারী, হাকিকত বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সর্বসম্মানিত বাহরুল উলূম জনাব মাওলানা আবুল বরাকাত সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল গণি আচ্ছাফী আল্ মকবুল কাঞ্চনপুরী কদ্দাসাল্লাহু সিররাহুন্নূরী

ভাষান্তরঃ

• বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর •

আরবী ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে এক অনন্য গ্রন্থ 'আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' ইসলাম ধর্মদর্শনের নিখাদ দর্শন কলমের আঁচড়ে যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ় বাধনে দীপ্তি ছড়িয়েছে। প্রতি মূহূর্তে চমকের দোলায় চমকে উঠে পাঠক। উন্মোচিত হয় বিবেকের রুদ্ধদ্বার, উদ্বেলিত হয় অনন্ত প্রেমাবেগ। অপসারিত হয় দ্বিত্বের পর্দা। গ্রন্থটি প্রত্যেক খোদা অন্বেষীর জন্য অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার যোগ্য গাইড লাইন। মুরিদ বা উদ্দেশীর জন্য মুরাদ বা উদ্দেশিত। রুগ্নান্তরের চিকিৎসায় একই সাথে ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

সূফি দর্শন আজ কিছু সংখ্যক মতলববাজের খপ্পরে পড়ে নিজস্ব রূপ-যৌবন তথা স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। সূফি বেশধারী ব্যবসায়ীদের প্রতারণায় ফেঁসে দ্বীন-দুনিয়া উভয় কুলহারা মানুষ এ পবিত্র দর্শনকে ঘৃণার থুথু ছিটিয়ে দিচ্ছে গাদায় গাদায়। বিশেষতঃ নিরেট সূফি দর্শনের যুগোপযোগী সংস্করণ মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতে মন্দ বলছে মাইজভাণ্ডারীদেরকে। এহেন পরিস্থিতিতে সূফি দর্শন ও মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার নির্ভেজাল দর্শন বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সমীপে তুলে ধরার নিমিত্তে উক্ত গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইলহামী জ্ঞানের সফল ভাষ্যকার বাহরুল উলূম আল্লামা মকবুল রচিত আঈনায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারী বা 'গাউসুল্লাহিল আ'যম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবন চরিত' এ প্রভুর দর্পণ' গ্রন্থটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতল সমুদ্র। সিন্ধু তলের মুক্তা আহরণ ডুবুরীর পক্ষেই সম্ভব। কৃতি লেখক ও অনুবাদক জনাব বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর অতি সাহসিকতার সাথে উক্ত গ্রন্থের সাবলীল অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। আলোকধারার পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

পূর্ব প্রকাশের পরঃ

তৃতীয় পরতও বা রশ্মিঃ নাম রাখা ও দুগ্ধ পান অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা যে, আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা নিজের অনন্ত অনুগ্রহ ও অসীম দয়ায় আপন খাস মাহবুব বা প্রেমাস্পদ, গাউসে পাক, হাবীবে হযরতে সাহেবে লাওলাক'কে হিদায়তের রবি করে ইরশাদ ও রাহবরীর গগণকে নূরে ভরপুর করেছেন। নাসূতী জগতের গোমরাহীর আঁধার রজনীকে নূরানী চেহারার জ্যোতিতে আলোময় দিবসে পরিণত করেছেন। বরং উর্ধজগতের ফিরিস্তাদেরও 'নূরুন আলা নূর' বা আলোর উপর আলোময় করেছে। নয় নয় বরং পার্থিব জগতকে উর্ধক্ষ জগতের ঈর্ষণীয় করে দেখালেন। নিজেই গাউসিয়তের পর্দা ও কুতবিয়তের ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে নিজের প্রেমাস্পদত্ব ও সুন্দরের চমক প্রদর্শন করলেন।

আপন দৃষ্টির ফুল-কলিতে দুনিয়ার পুষ্পোদ্যানকে জান্নাতি বাগের ঐশ্বর্যে পরিণত করলেন। মূলক ও মালাকূতের সকল অধিবাসীকে প্রেমবিভোর বুলবুলবৎ আপন জগত আলোকিত গুলআননের অনুরক্ত বানিয়েছেন। আপন হাবীবে মুকাররম রাসূলে মুয়াযযম (দঃ)'র পাক নাম ও নিজের পূত নামকে আশিক বা প্রেমিক ও মাশুক বা প্রেমাস্পদ রূপ পরস্পর মিলিয়ে 'আহমদ উল্লাহ্' নামকরণ করলেন। আপন মাহবুব বা প্রেমাস্পদের পবিত্র সত্তাকে عاشقیت বা প্রেমিকত্ব ও معشوقیت বা প্রেমাস্পদত্বের পদমর্যাদায় উভয়ের যুগল বিকাশ ও উজ্জ্বল দর্পণ বানিয়েছেন। ان الله معنا 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন' রহস্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সে দর্পণে দেখিয়েছেন। ورفعنا لک ذکرک 'এবং তোমার স্মরণ তোমার জন্য বুলন্দ করেছি'র হাকীকত এ পর্দায় প্রতিভাত।

احمد کو خدا مت کہو احمد خدا نہیں + لیکن خدا کے نام سے کوئی دم جدا نہیں

'আহমদকে খোদা বলোনা আহমদ খোদা নয়, খোদার নাম থেকে কিন্তু কোন সময় জুদা নয়' ঘোষণায় একত্বের গোপন রহস্য অভিহিত ও জ্ঞানান দিয়েছেন।

معشوقی اور عاشقی دونوں ہیں آپکو + محمودی اور حامدی دونوں ہیں آپ کو

কবিতা

প্রেমিকত্ব ও প্রেমাস্পদত্ব দু'টিই তোমাতে সমাবেশিত

প্রশংসক ও প্রশংসিত যুগল শানে তুমিই বিরাজিত।

چونام احمدش واصل مع اللہ + فوصل اللہ فی درج المعالی.

বয়াত

তোমার আহমদ নাম যবে আল্লাহ্‌র সাথে মিলন লাভকারী
পৌঁছেছে তাই আল্লাহ্‌তে উচ্চতার সিঁড়ি অতিক্রম করি।

غزل

آے مرے باطن میں اے جان جہاں مجھ ڈاری + تیرے جدائی میں شبہا دیکھئے کیا بے قراری
نوری قدم سے دیجئے روشنی میرے بانکو + اے تیرے چہرہ کی جھلک شمس و قمر بھی مشتری
مجھ نین تجھکو بناؤنگا مرے پیار سجن + بھر کے نین دیکھوں ترے حسن کا تب جلوہ گری
زلف کا دام میں پیادانہ ہے خال جو ترے + ہر دو جہاں اسیر ہیں موسیٰ بھی اور سامری
میم کی گھونگھٹ میں چھپے خوب کی تم نے دلبری + امتی رنگ میں کبھی کبھی لیا پیمبری
لیلیٰ کی رنگ میں کبھی قیس کا دلکو تمنے لے + جاں کبھی فرہاد کا دکھلایا شیرین پیکری
لفظ انا الحق بول کے دار پہ کبھی آ چڑھا + مفتی بنے کبھی دیا فتوائے کفر و کافری
بیدل مقبول کو اب کر کے دیوانہ در بدر + غوث الاعظم دیا ہے تمنے خوب داد دلبری

গযল

এস আমার কুঞ্জবনে হে জগৎপ্রাণ মাইজভাণ্ডারী
তোমার বিরহতে শাহা দেখ কি যে বেকরারী।
নূরী কদম হতে দাও রশ্মি আমার বাগে
হে তব চেহারার ঝলক রবি, শশী, তারার উপর।
নয়নের অঞ্জন করবো তোমায় হে মোর প্রিয় সজনী
চোখ ভরিয়ে দেখবো তোমার রূপের তখন বাহাদুরী।
বক্র যুলফির ফাঁদে প্রিয়া তিলক ফোটা যে তোমার
উভয় জগত বন্দি মূসা কিবা সামেরী।
মিমের ঘোমটায় চুপে করেছো উত্তম দিলবরী
উম্মতের রঙে কভু নিয়েছ কখনও পয়গম্বরী।
লায়লার রূপে কভু কায়সের দিল হরলে তুমি
ফরহাদের প্রাণও নিলে দেখিয়ে আনন রূপে শিরি।
'আনাল হক্ব' বাক্য বলে শূলিতে কভু এসে চড়লে
মুফতী হয়ে ফের দিলে ফত্ওয়ায়ে কুফর ও কাফেরী।
বেদিল মকবূলে এবার করে দিওয়ানা দর বদর
গাউসুল আ'যম দেখালে তুমি প্রেমাস্পদত্বের ঠমক তোমারী।

আল্লাহু আকবর! কী যে সম্মানিত নাম, তার অক্ষর চতুষ্টয়ের হাকীকত জগতের মৌলিক উপাদান চুতষ্টয় নির্দেশক। সুবহানাল্লাহিল আযীম! কী রূপ মর্যাদাবান নাম যে, তার 'আলিফ' মকামে আহদিয়ত বা এককত্বেরস্তরের প্রতি ইঙ্গিতবহ। তাবারাকাল্লাহুল করীম! কী সুন্দর নাম যে, 'হায়ে হলকী'র হাকীকত অস্তিত্ব জগত-বৃত্তের প্রিয় মদদগার। তা'আলাল্লাহুল জলীল! কী রূপ হৃদয়গ্রাহী নাম যে 'মীম' তার অস্তিত্বপ্রদর্শী অনস্তিত্ব জগতের অস্তিত্ববৃত্ত। বারাকাল্লাহুল মজীদ! যে, 'দাল' অক্ষর তার অস্তিত্ব দপ্তরের একত্ব ও বহুত্বর রহস্যের দলীল। আল্লাহু! আল্লাহু! কী যে মধুময় নাম, প্রথম দুই অক্ষর 'আলিফ' ও 'হায়ে হলকী'র উচ্চারণে উভয় ওষ্ঠ প্রান্তিক উদ্দীপনায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত খুলে যায়। শেষ দুই অক্ষরের মধ্যে 'মীম'র উচ্চারণে উভয় ওষ্ঠ অত্যন্ত উৎসাহে কুঞ্চিত হয় এবং 'দালে মওকূফ'র উচ্চারণের সময় অস্থির হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুস্থিরতা আসে।

الا بذکر اللہ تطمئن القلوب

'খবরদার! আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয় সমূহ সুস্থির হয়'র উপর অবস্থিতি ও অবগতি যেন ঘোষিত হচ্ছে।

غزل

لیتے نام اس پیارے کا + دو لب شوق سے کھلجاتا
ذوق سے پھر خود سٹ آتا + کیا میٹھے نام پیا کا
شریں کر دیتے زبان کو + پیارے نام ہے پیارے کا
جس نام پہ چرخ زمیں فدا + جس نام کزیب ہے عرش وسما
جس نام شیدا ہے خدا + نہ نثاروں کیوں جی جاں کو
کعبہ ہو تم عالم کا + ترے طرف کو سجدہ ہے بجا
جامی نے کیا خوب لکھا + والیک نسجد جو کہا
سمجھے کیا ترا کوئی شاں کو + ذرہ تیرے استاں کا
درۂ تاج عرش وسما + انصاف سے کہئے تو بھلا
کس کو ہے ایسی رتبہ + عشق ہے تیرے رحمان کو
مکتب میں ناز و ادا کا + استادی کی شہرہ ہے ترا
کتب عشوہ و ناز و ادا + منسوخ ہوا اور وں کا
دیتے ہی تو درس قرآن کو + اے پیارے پیا غوث خدا
مقبول عشق کا ہے مارا + ہجر سے تیرے آوارہ
حرم دل پر بیٹھے آ + کیجئے آباد ویران کو

নিতে নাম সে প্রিয়ার দু' ওষ্ঠ উৎসাহে খুলে যায়
উদ্দীপনায় ফের মিলে যায় কতই মিষ্ট নাম প্রিয়ার।
মধুময় করে দেয় রসনায় প্রিয় নামযে প্রিয়ার।
যে নামে পৃথিবী উৎসর্গ যে নামে শোভে আকাশ-আর্শ
যে নামে খোদা পাগলপারা সে নামে কেন দিবনা প্রাণ আমার।
কিবলা কাবা তুমি জগতের সাজদা সাজে পানে তোমার
জামী লিখেছেন কতই সুন্দর সাজদা করি মোরা দিকে তোমার।

বুঝবে কি কেউ শান তোমার অণু যে তব আস্তানার
আকাশ ও আর্শের মুকুট মুক্তা ইনসাফে বললে এমনই বলা
পেল কেবা এমন মর্যাদা আল্লাহ্ বিভোর প্রেমে তোমার।
পাঠশালে প্রেম ছলনার প্রসিদ্ধি তব শিক্ষকতার,
নমক, ঠমক ও ছলনার পুস্তকাদি রহিত হল অন্য সবার,
দিতে তুমি কুরআনের সবক হে প্রিয়া প্রিয় গাউস খোদার।
মকবুল তব প্রেমের মরা বিরহে তোমার দিশাহারা
দিলের হেরেমে বস এবে কর আবাদ বিধ্বস্ত হৃদয় আমার।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের প্রিয় পয়গম্বর আলাইহি সালাওয়াতিল্লাহিল আকবর দু'নামে নামকরণকৃত। তাঁর পবিত্র নামদ্বয় কুরআনে মাজীদে উল্লিখিত। " محمد رسول الله " আয়াতে পাকে 'মুহাম্মদ' এবং হযরত ঈসা রূহুল্লাহর শুভসংবাদের বর্ণনায় اسمه احمد 'আহমদ' উল্লিখিত রয়েছে। এ নামদ্বয়ের প্রত্যেকটির বেলায়ত ভিন্ন। বেলায়তে মুহাম্মদী যতই তাঁর মকামে মহবুবিয়ত বা প্রেমাস্পদত্ব প্রকাশক কিন্তু ওখানে মাহবুবিয়ত অবিমিশ্রিত নয় বরং মুহিবিক্ষয়ত বা প্রেমিকত্বের উপাদানের টুকু মিশ্রণ রয়েছে। যদিও এ মিশ্রণ সত্তাগত নয় তবুও অবিমিশ্রিত প্রেমাস্পদত্বের প্রতিবন্ধক। বেলায়তে আহমদী মাহবুবিয়তের মিশ্রণ মুক্ত মুহিবিক্ষয়ত প্রকাশক। এ বেলায়ত ঐ বেলায়ত অপেক্ষা মতলুব বা অন্বেষিতের এক স্তর নিকটতর এবং প্রেমিকের কাছে বাঞ্ছিত। কেননা, মাহবুব বা প্রেমাস্পদ মাহবুবিয়ত বা প্রেমাস্পদত্বে যত পরিপূর্ণ হবে অমুখাপেক্ষীতাও তত পরিপূর্ণ হবে; এবং প্রেমিকের দৃষ্টিতে শোভিত ও কমনীয় হবে। অতএব, প্রেমিককে নিজের দিকে বেশী আকর্ষিত, মোহিত ও আসক্ত করবে।

শে'র

تنہا نہیں آفت مرا زیبائی ہے اسکا ÷ جانکاہ بلا میرا بے پروائی ہے اسکا

একা নয় দুর্দশা মোর শোভাও রয়েছে তাঁর
প্রাণের বিপদ আমার অমনোযোগীতা তাঁর।

বালা বা মুসিবত দ্বারা উদ্দেশ্য প্রেমের আধিক্য; যা আশেক বা প্রেমিকের বাঞ্ছিত। সুবহানাল্লাহি! 'আহমদ' আশ্চর্য নাম যে, পবিত্র শব্দ 'আহাদ'র যৌগিকতায় গঠিত। মীম অক্ষরের বৃত্ত আল্লাহ্র রহস্যাবলীর সূক্ষ্মতত্ত্বাদি। উপমাহীন জগতে এ অবকাশ ছিলনা যে, উপমা জগতে এ গোপন মুক্তামালার ব্যাখ্যা মীমের বৃত্ত ছাড়া হতে পারে। যদি অবকাশ থাকতো আল্লাহ্তা'আলা তা দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন। আহাদ তার কোন অংশীদার নেই, মীমের বৃত্ত তাতে উবূদিয়ত বা বান্দেগীর শৃঙ্খল যে, তা বান্দাকে খোদা থেকে পৃথক করেছে। অতঃপর বান্দা 'আহাদ' শব্দের সে মীমের বৃত্ত, তাঁরই সম্মানে এসেছে এবং তাঁরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। তাঁর ও তাঁর আলের উপর সালাত ও সালাম।

غزل

عجب محبوب ہے نام پیا جب لب پہ آتا ہے ÷ دل نگوں جھٹ پٹ جا کھوں سوں سا جلاتا ہے
خیال زلف اسکے مجھ کو سودائی بناتا ہے + کہ زنجیر عقل کو یہ دل وحشی توڑاتا ہے
ذرا دیکھو تو وہ پیارے یہ کیا کیا شاں دکھاتا ہے ÷ جھلک چہریکا دکھلا کر جگت شیدا بناتا ہے
وہ جو چہرہ دکھاتا ہے اگر مجھ حقیقت میں + وہ چہرے کی بہانے آئینہ قدرت دکھاتا ہے
وہ ابرو اور چہرے کا جو دکھلاتا تجھے جلوہ ÷ نشان مصحف و محراب و مسجد کا بتاتا ہے
نہیں وہ شعلہ روح ہے اسی پردے میں وہ سکو + خلیل اللہ سا آتش پرستی کو سکھاتا ہے
ارے ناداں تو کیا سمجھا وہ کیسا گنج مخفی ہے ÷ محمد سا تجھے وہ نقشہ وحدت بتاتا ہے
وہ دم بے لے کے چلنے اور رک رک کر کے وہ کہنے + سنگر کی نشاں میں دلبری اپنا جتاتا ہے
بول اے طوطی بنگالہ تو دلبر کی بولی میں ÷ گلے پر میرے تے نے ترے چھریاں چلاتا ہے
ترے مقبول بیدل کو اے غوث پاک مجھ بدار + ترے شوق قدمبوسی دکھو کیا کچھ دکھاتا ہے

গযল

আজব প্রিয় নাম প্রিয়ার, যবে মুখে আসে
অস্থির হৃদয় ঝটপট, প্রাণে সরিষাবৎ জলায়।
তাঁর যুলফির ধ্যান, মোরে পাগলপারা বানায়
বিবেকের শক্ত শিকল, ছিঁড়ে বিচলিত মতন উম্মাদনায়।
টুকু দেখ যদি সে প্রিয়, কী কী শান দেখায়
চেহরার ঝলক দেখিয়ে, জগত দিওয়ানা বানায়।
সে যে চেহরা দেখায়, যদি বুঝ হাকীকতে
সে চেহরার বাহানায়, কুদরতের দর্পণ যে দেখায়।
সে বক্র ভ্রূ ও চেহরার, যে জলওয়া তোমা দেখায়
কুরআন, মেহরাব ও মসজিদ, সবের নিশান বাতলায়।
নয় সে শিখামুখী, মগজ সে এ পর্দায় সকলে
খলিলুল্লাহ রূপে, অগ্নিপূজকদের প্রেম শিখায়।
হত মূর্খ তুমি কি বুঝবে, সে কেমন গোপ্ত খনি
নবী মুহাম্মদ রূপে, তোমায় ওয়াহদতের নক্সা দেখায়।
সে বিরামহীণ চলা, সে থমকে থমকে বলা
দুঃখ দাতার নিশানায়, আপন প্রেমাস্পদত্ব দেখায়।
হে বাঙলার তুতী তুমি, বললে প্রেমাস্পদের বচনে
তব গানে আমার গলে, প্রেম কাটারী যে চালায়।
তব মকবুল বেদিলে, হে গাউসে পাকে মাইজভাণ্ডার
তব পদচুম্বন উদ্দীপনা দেখ কি কি যে দেখায়।

(চলবে)

ঈমান ও আখলাক ঃ পর্ব-০৫

• সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন রায়হান •

ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র অনুপম সৃষ্টি: আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশ্‌তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, তারা যে কোন প্রকার রুপ ধারণ করতে পারেন। কোন সময় মানুষ কোন সময় অন্য কিছুর আকৃতি প্রকাশ হয়েছে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালা চারজন ফেরেশ্‌তা হযরত ইসরাফিল, মিকাঈল, জিব্রাইল ও আজ্রাইল (আলাইহিমুস্‌সালাম) কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের উপর সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্ম এবং পৃথিবী পরিচালনার ভার ন্যাস্ত করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতিত কোন কিছু করেন না। তাঁরা ঐ কাজই করেন যা আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ হয়। এমনকি ইচ্ছাকৃত, ভুলক্রমে বা ত্রুটি হিসেবে ও কিছু করেন না । ওহী বহন ও রিসালতের কাজ হযরত জীব্রাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) কে, বৃষ্টি বর্ষণ রিজিক বন্টণের ভার হযরত মিকাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) কে, জান বা রুহ্ কবজ করার দায়িত্ব হযরত আজ্রাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) এর হাতে, কিয়ামত দিবসের পূর্বে সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার ভার হযরত ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) এর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ফেরেশ্‌তাগণ স্ত্রী ও নন, পুরুষ ও নন। তাঁদেরকে পুরাতন অথবা সৃষ্টিকর্তা অথবা সৃষ্টিকর্তার অংশ মনে করা কুফুরী। তাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি (খাল্‌ক) ফেরেশ্‌তাগণের সংখ্যা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তায়ালা সঠিক জানেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞান দান করেছেন। ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেক প্রকারের ছোট বড় পাপ ও গুনাহ হতে পবিত্র। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে নানাপ্রকার খেদমত ও কাজ অর্পন করেছেন। অনেকের দায়িত্ব নবিগণের খেদমতে ওহী আনা, কারও দায়িত্ব বায়ু চালনা করা, কারও দায়িত্ব খাদ্য পৌঁছান, অনেকের দায়িত্ব মায়ের পেটে সন্তান গঠন করা, অনেকের দায়িত্ব মানুষ্য জাতির দেহের ভিতরের অংশসমুহ পরিচালনা করা। অনেকের দায়িত্ব মানুষকে শয়তান ও শত্রু হতে রক্ষা করা। তাছাড়া অনেকের দায়িত্ব জিকরুল্লাহ্‌র মজলিশের অনুসন্ধান পূর্বক তথায় হাজির হওয়া, অনেকের দায়িত্ব মানুষের কর্মফল লেখা, অনেকের দায়িত্ব হুজুরে পাক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হওয়া, অনেকের দায়িত্ব মুসলমানগণের দরুদ শরীফ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর নিকট পৌঁছানো। আর অনেককে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রশ্নাদি করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, অনেককে রুহ্ বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আর অনেকের দায়িত্ব হয়েছে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা এবং অনেকের দায়িত্ব পাপী ব্যক্তির কবরে আযাব দেওয়া। অনেকের দায়িত্ব পূণ্যবান ব্যক্তির কবরে শান্তি দেওয়া। এইভাবে বিভিন্ন ধরণের কাজে ফেরেশ্‌তাগণ নিয়োজিত রয়েছে। ইহা ব্যতিত আরও অনেক কাজ রয়েছে যাতে ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছে। অসংখ্য ফেরেশ্‌তা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত ও জিকিরে মগ্ন রয়েছে, আরও অসংখ্য ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফে রত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন হে আল্লাহ্! আমাকে সপ্ত আকাশের ও সপ্ত জমিনের শক্তি দান করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা তা দান করেন। তারপর বাতাস ও পাহাড় এর শক্তি চাইলে তাও দান করেন। হিংস্র জন্তুর শক্তি প্রার্থনা করলে তাও আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে দান করেন। তাঁর উভয় পা হইতে মাথা পর্যন্ত লোম দ্বারা আবৃত, মুখ ও জিহ্বা ডানা দ্বারা আবৃত। তাঁর প্রত্যেক লোমে হাজার হাজার চেহরা, প্রত্যেক চেহরায় রয়েছে হাজার হাজার মুখ, প্রত্যেক মুখে রয়েছে হাজার হাজার জিহ্বা, প্রতিটি জিহ্বা দ্বারা শত সহস্র ভাষায় আল্লাহ্‌তায়ালার তসবীহ্ পাঠ করছে। তাঁর প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে একজন ফেরেশ্‌তা পয়দা হচ্ছে যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে নিমগ্ন। তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহ্‌র খাস ফেরেশ্‌তা, আরশ বহনকারী ও কিরামান কাতেবীন ফেরেশ্‌তা, তাঁরা সবাই হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্‌সালাম এর আকৃতিতে ভূষিত। হযরত ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) প্রতিদিন তিনবার করে দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যার দরুন তাঁর শরীর গলে ধনুকের ছিলার মত হয়ে যায় তিনি বিনয়ের সহিত ক্রন্দন করতে থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করতে বাঁধা না দিতেন তাহলে সমস্ত পৃথিবী তাঁর চোখের পানিতে ভেসে

যেত, হযরত নুহ্ আলাইহিস্‌সালাম এর তুফানের মত। হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্‌সালাম এর শরীর এত যে বৃহদাকারের যদি দুনিয়ার সমস্ত সমুদ্র ও নদী-নালার পানি তাঁর মস্তকের উপর ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে এক বিন্দু পানিও মাটিতে পরবে না।

মিকাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) কে আল্লাহ্‌তায়ালা ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) এর পাঁচশত বছর পর পয়দা করেছেন। তাঁর মাথা হতে পা পর্যন্ত জাফরানি লোম দ্বারা আবৃত। তাঁর ডানা পান্নার তৈরী। তাঁর প্রতিটি লোমে হাজার হাজার চেহারা, প্রতিটি চেহরাতে হাজার হাজার মুখ, প্রতিটি মুখে হাজার হাজার জিহ্বা, প্রতিটি জিহ্বায় হাজার হাজার ভাষা। আবার জিহ্বাতে হাজার হাজার চক্ষুও রয়েছে, সেই চক্ষু দিয়ে গোনাহ্‌গার মুমিনদের জন্য দয়া ও করুণা করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে রহমতের জন্য ক্রন্দন করতে থাকে। ক্রন্দনের সময় প্রতিটি চক্ষু হতে সত্তর হাজার পানির ফোঁটা পড়তে থাকে, সেই প্রত্যেক ফোঁটা হতে একজন ফেরেশ্‌তা তৈরী হয় হযরত ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) এর আকৃতিতে। তারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ পাঠে লিপ্ত থাকবে। তাদেরকে 'কাররুবিউন' বলা হয় এরা মিকাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) এর সহযোগী ফেরেশ্‌তা। তারা বৃষ্টি বর্ষণ, শস্যাদি উৎপাদন, রিজিক ও ফল ফলাদির কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সমুদ্রের প্রতি বিন্দু পানির জন্য, বৃক্ষের প্রতিটি ফলের জন্য, জমিনের প্রত্যেক উদ্ভিদের কাজে একজন করে নিযুক্ত ফেরেশ্‌তা তারাই।

আর হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) কে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মিকাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) এর পাঁচশত বছর পর সৃষ্টি করেছেন। তার একহাজার ছয়শত পাখা আছে, তাঁর মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর জাফরানী লোমে আবৃত। তাঁর উভয় চোখের সামনে একটি সূর্য আছে, আর প্রতিটি লোমের উপর এক একটি চন্দ্র ও নক্ষত্র রয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস্‌সালাম) প্রতিদিন (৩৬০) তিনশত ষাটবার নূরের সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করেন, তা হতে যখন তিনি বের হন তখন তাঁর ডানা হতে অনেক অনেক নূরের ফোঁটা ঝড়ে পড়ে। সেই নূরের প্রতিটি ফোঁটা হতে তাঁর অবিকল আকৃতির এক একটি ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করেন। তাঁরা সবাই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তসবীহ্ পাঠে নিয়োজিত। তাদের নাম হল 'রুহানিয়্যুউন'। আর মালাকুল মাউত আজরাঈল (আলাইহিস্‌সালাম) এর আকৃতি হুবহু ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) এরই আকৃতি। তাঁর চেহারা, জিহ্বা, ডানা, সবকিছুই ইসরাফিল (আলাইহিস্‌সালাম) এর মত।

তথ্য সূত্রঃ

১. বাহারে শরীয়ত
২. গুনিয়াতুত তালেবীন
৩. দাকায়েকুল হাকায়েক

ঢাকার সম্মানিত পাঠকদের জন্য

সুসংবাদ

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে এখন থেকে ঢাকাস্থ খানকাহ্ শরীফে **মাসিক আলোকধারা** নিয়মিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ

'বাইত উল আস্‌ফিয়া'

মাইজভাণ্ডারী খানকাহ্ শরীফ, খাদেম বাড়ী, ৩য় তলা, বাড়ী # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা- শাহ আলী, মিরপুর, সেকশন-১, ঢাকা-১২১৬)।

যোগাযোগঃ 01716-655583 **(খাদেম)**

E-mail: baitulashfia@gmail.com

১০ পৌষ বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ৮৫তম খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মাইজভাণ্ডার গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পূর্ব বাড়ি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় রাহ্‌বারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.জি.আ.)-এর প্রদত্ত ভাষণ

মুনিবের কদমে উৎসর্গীত হওয়ার চেয়ে বড় হাদিয়া আর কিছু হতে পারে না

হাদিয়া হিসেবে শুধু গরু-মহিষ-ছাগল আনা নয়, বরং অধিকসংখ্যক মানুষ মিলে নিজেরাই হাদিয়া হয়ে দরবারে আসবেন। মাইজভাণ্ডার শরিফ শুধু মকসুদ হাসিলের দরবার নয়, এখানে দুনিয়া-আখেরাত তথা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়েরই দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। সালাম পেশ করছি হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা আকদসে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম, বিশেষ করে মহান খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে আজকের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত আশেকানে মোস্তফা (দঃ), আশেকানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, আশেকানে হক ভাণ্ডারী এবং মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সদস্যবৃন্দ, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ – আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সকল পর্যায়ের আশেকানদেরকে, আজকে এখানে যারা দূর দূরান্ত থেকে হাজির হয়েছেন, আমরা এক মহান দিনকে উদযাপনের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি। বিশ্বঅলির খোশরোজ শরিফের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য, পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এবং এর জন্য যে আয়োজন প্রয়োজন সেটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মতবিনিময় ও প্রস্তুতি সভা করছি আমরা। যে মহান দিনগুলো আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি আমরা সকলেই জানি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের যে মহান নেয়ামত আমরা পেয়েছি তার শোকরিয়া আদায়ের দিন, ভ্রাতৃ সম্মেলনের দিন। দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এসে কিছুটা সময় কাটানোর দিন, নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধির দিন। নিজের অবস্থান, নিজের আত্মার অবস্থার উপলব্ধির দিন। ঐ দিনগুলো যথোপযুক্ত মর্যাদায় আয়োজনের জন্য যে ব্যবস্থাপনা দরকার তা আপনারা জানেন। আমি মূলত এটি বলতে চাই যে, হজ্বে যাওয়ার জন্য শুধু আর্থিক প্রস্তুতি নয়, শুধু কায়িক বা শারীরিক প্রস্তুতি নয়, মানসিক প্রস্তুতির যে প্রশ্ন থাকে আমি সেটি বলতে চাই।

এই যে একজন আশেক, কিংবা উনার সন্তান কিংবা উনার একজন আত্মীয়, কিংবা একজন উৎসাহী, অনুরাগী, দরবারে আসবেন, কিংবা সকলেই মিলে দরবার শরিফে ওরশ-খোশরোজসহ নানান অনুষ্ঠানে আসবেন, তার জন্য আমাদের কিছু মানসিক প্রস্তুতির প্রশ্ন থাকে। আমরা জানি যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের আউলিয়ায়ে কেরাম, আমরা আজও বলছি যে প্রত্যেকেই ছিলেন দাঈ ইলাল্লাহ্। আল্লাহ্‌র দিকে তাঁরা ডেকেছেন মানুষকে, তাঁদের মিশনটি ছিলো একটি দাওয়াতের মিশন, ইসলামের দিকে, ঈমানের দিকে, ইহসানের দিকে, নবীর আদর্শের দিকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দিকে তাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষকে আহ্বান করেন। তাঁদের সারা জীবনের যে কর্মসূচি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ডাকাই হচ্ছে তাঁদের সমস্ত কর্মসূচির মূল। এই দিকটি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির কর্মসূচি প্রণয়ন করছি, দিবস উদযাপন করছি কিংবা নানা আয়োজন করছি প্রস্তুতি নিচ্ছি–আমরা কিন্তু একজন মেহমানকে উৎসাহী, অনুরাগী করছি কিংবা মানুষকে যখন আমরা দরবারে দাওয়াত দিচ্ছি, এটি কিন্তু দরবারের দাওয়াত নয়। এটি আসলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রাস্তার দিকে দাওয়াত দেওয়া। হজ্বে যাওয়ার জন্য যেভাবে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, আল্লাহ্‌র দরবারে মেহমান হয়ে যাওয়ার যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, দরবারে আসার জন্য কিন্তু সেরকম একটি মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। এখন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে – অর্থাৎ এই ওরশ মোবারককে কেন্দ্র করে আপনাদের চেনা জানা লোক যারা আছেন, কিংবা উঠতি প্রজন্ম, নতুন প্রজন্ম যখন দরবার শরিফে আসবে তখন কিন্তু এই মানসিক প্রস্তুত নিয়েই যেন আসেন। দরবারের যে আদব-আখলাক, এখানকার যে ঐতিহ্য, দরবারের যে মূল চেতনার কথা আপনাদের যথেষ্ট অবগতি আছে, এর বিপরীতে যারা আছেন তাদের অবস্থা-চিন্তা-চেতনা হয়ত ভিন্ন রকমের হতে পারে। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেকেই একটু অন্যরকম হতেই পারে – বয়সের কারণে হোক, অভিজ্ঞতার কারণে হোক, সোহবতের কারণে হোক, নানান কারণে। এসব মানুষকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। সবাই যেন পূর্ণ একটি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে দরবারে আসতে পারেন আমাদের সেই সুযোগ করে দিতে হবে। দরবারে এসে একজন লোক

কীভাবে সময় ব্যয় করবে তাকে তা বুঝিয়ে বলতে হবে। বিশেষ দিনগুলোতে এখানে উৎসবমুখর একটি অবস্থা মনে হয়। দরবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী আশেকদের জন্য ওরশ কিংবা খোশরোজ শরিফ হচ্ছে ঈদের দিন তথা আনন্দের দিন। দরবারের এ বিষয়গুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। হয়ত অনেকেই যা গভীরভাবে অবহিত নয়।

এখানে অবস্থানের সময়টিকে তারা কিভাবে ব্যয় করবে। দরবারে শরিফে আসা লোকজন কতটা গুরুত্বের সাথে সময় ব্যয় করবে, কতটা ধৈর্যের সাথে আদব-আখলাক বজায় রেখে এখানে অবস্থান করবে সবার মাঝে বিস্তারিত একটি ধারণা দেয়া জরুরি। দরবারে এসে কেউ গল্প গুজব করবেনা বা এখানে খাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবেনা, হুড়োহুড়ি করবেনা কিংবা কোন রুক্ষ আচরণ করবেনা। সবাই এখানে আসবেন ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকার নিয়তে। খুলুসিয়াত তথা একাগ্রতার সাথে জিকির আজকারে রত থাকবেন। পবিত্র আলোচনায় থাকবেন, পবিত্র চিন্তায় থাকবেন। একথা খেয়াল রাখবেন যে, দরবারে যতক্ষণ আছেন আল্লাহর রাস্তার মধ্যে আছেন এবং পবিত্র জায়গার মধ্যে আছেন। এভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই সবাইকে দরবারে আসতে হবে। মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির দায়িত্বশীল বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে যারা মুরব্বিগণ আছেন তাদের এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। দরবারে যারা আসবে তাদেরকে মানসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শুধু এটি মনে করলে হবে না যে, আমি একটি মকসুদ হাসিলের জন্য দরবারে এসেছি। কারণ মাইজভাণ্ডার শরিফ শুধু মকসুদ হাসিলের দরবার নয়। এ দরবারে দুনিয়া-আখেরাত উভয়েরই দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। দরবারে আমাদের দুনিয়াও যেমন আছে, তেমনি আখেরাতও আছে। আমাদের বস্তুগত যে প্রয়োজন সেটির দিকনির্দেশনাও আছে, আবার আধ্যাত্মিক যে দিকনির্দেশনা সেটিও আছে। আমি শুধু বস্তুগত কল্যাণ অর্জনের জন্য এখানে আসলাম তা কিন্তু ঠিক নয়। এটি একটি খণ্ডিত দিক। এ রকম হলে দরবারের সার্বিক কল্যাণময় দিক যেন পুরোপুরি উপেক্ষাই করা হয়। শুধু বস্তুর মধ্যে পড়ে রইলাম, আমি দরবারকে শুধু চাওয়ার পাওয়ার মধ্যে সীমিত করে ফেললাম তা কিন্তু ঠিক নয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু দরবারের শিক্ষা-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি দরবারকে বুঝার ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে আমি মনে করি। বস্তুগত দিককে প্রাধান্য দেওয়া মানে দরবারকে পুরোপুরি বুঝতে অক্ষমতা এবং সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যর্থতার একটি কারণ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে আমি আবারও বলছি, যারা হয়তো নতুন এসেছেন, কিংবা নব প্রজন্ম যাদের বয়স অল্প, হাদিয়া নিয়ে আসা এটি একটি আনন্দের উপায় হিসাবে তারা মনে করতে পারে। তারা ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এটি বুঝিয়ে দিতে হবে যে, হাদিয়ার সাথে যাওয়া এটি হচ্ছে আমার অহংয়ের বিনাশ ঘটানোর একটি উছিলা। তা হচ্ছে মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বদের সামনে তথা আল্লাহর কুদরতের সামনে নিজেকে আমি লুটিয়ে ও বিলীন করে দিচ্ছি। এই অনুভূতি নিয়ে আমাকে দরবারে আসতে হবে। তো এই শিক্ষাটুকো আপনারা বেশী করে উপলব্ধির চেষ্টা করবেন। আলোচনার মাধ্যমে, আলাদা প্রোগ্রাম-সভা-সেমিনারের আয়োজন করে আমরা এই দিকটি ফোকাস করতে পারি, সবাইকে জানিয়ে দিতে পারি। আপনারা যখন ক্যাম্পে বসবেন কিংবা ছোট ছোট অনুষ্ঠান করে তখনও এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন, উপদেশ-গঠনমূলক পরামর্শ দিতে পারেন সবাইকে। এভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আমরা জেনেছি মহান রব্বুল আলামিন বলেছেন-'ক্বো আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা'- তোমরা নিজে নিজেদের রক্ষা কর এবং তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদেরও জাহান্নাম হতে বাঁচাও। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ পাকের এই নির্দেশনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের নিজের প্রতি দায়িত্ব তো আছেই আমরা সেটি পালন করার জন্য চেষ্টায় থাকবো, আশেপাশে আমাদের যারা আছে তাদের প্রতি ও পরিবার পরিজনসহ দরবারের ভক্ত যারা আছেন, তাদের প্রতি অবশ্যই আমাদের বিরাট দায়িত্ব আছে। তারা যাতে সঠিকভাবে দরবারকে বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, তো এই দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। এটি শুধু দরবারের ব্যাপার নয়, সমাজের জন্যও আমাদের অনেক করণীয় রয়েছে। সব জায়গায় সবার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন,- "ওদ্উ ইলা ছাবিলি রাব্বিকা বিল হেকমতে ওয়াল মাওআযাতিল হাসানাতি" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান কর অত্যন্ত সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে। কুরআন মজিদের এই নির্দেশনা আমাদের মেনে চলতে হবে।

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, দরবারের যে মিশন এটি হচ্ছে দাওয়াতের মিশন মূলত। এই দাওয়াতের ভঙ্গিটা হয়তো অন্যান্য যে দাওয়াতি ইসলামী আছে, তার চেয়ে ভিন্নতর। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ও তাঁর ভিন্ন ধর্মী আহ্বানে উজ্জীবিত আজ অসংখ্য মানুষ। তাই এখানে বলা প্রয়োজন। মানুষকে ভেতর থেকে বদলে দেয়া এবং যেকোনো মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মনোজগতের পরিবর্তন আনাই মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা ও দর্শনের মূল কথা। মাইজভাণ্ডারী দর্শন সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করতে চায় তা আমাদেরকে গভীরভাবে জানার সুযোগ করে দিতে হবে। মাইজভাণ্ডারী

ত্বরিকা ও দর্শন বুঝার জন্য ও অন্যকে বুঝানোর জন্য অনেক ধরনের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। রাব্বুল আলামিন যদি কবুল করেন এক্ষেত্রে আমরা আরও এগিয়ে যাব ইনশা'আল্লাহ। ভবিষ্যতে ১০ মাঘ উপলক্ষে কিছু হয়তো, মূলত ১০ মাঘ এবং ২৬ আশ্বিনকে কেন্দ্র করে আমরা বৃহত্তর কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করব।

১০ মাঘ, ২৬ আশ্বিন, ১০ পৌষ ঢোল-বাজনা সহকারে মিছিল করে সবাই দরবারে আগে এসেছেন এবং সামনেও আসবেন। তবে একটি বিষয়ে বলতে হয়, আমরা এখন সবকিছু অন্যজনকে অন্যভাবে ট্রান্সফার করে দিয়েছি। ট্রান্সফারটা কি রকম, আগে পিতা-মাতার ফাতেহা উপলক্ষে সন্তানেরা কুরআন তেলাওয়াত করতো। এখন কুরআন তেলাওয়াতের দায়িত্ব আমরা হুযুরদের কাছে ট্রান্সফার করে দিয়েছি। আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। বিষয়টি আমি আগেও বলেছি, কাওয়ালের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি, কাওয়ালের গান কাওয়াল করে, আমরা এদিক ওদিক ঘুরছি। মাইকে গান-ছেমা বাজছে আমরা এদিক-ওদিক ঘুরছি। আর দরবারে আসার সময় বাসের উপর মাইক লাগিয়ে দিয়েছি, মাইকে বাজছে কি বাজছে সেটি আমি জানিনা, হয়তো জানছি হয়তো জানছিনা। আর আমি অনেক সময় হয়তো বেশ গল্প গুজবের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদেরকে দরবারে আসার সময়টা প্রতিটি মুহূর্ত তকবিরের মধ্যে থাকতে হবে। না'রার মধ্যে থাকতে হবে। না'রায়ে তকবির, না'রায়ে রেসালতের মধ্যে থাকতে হবে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর না'রা দিতে হবে। এবং নানান গজলের মধ্যে থাকতে হবে। মাইক একটি যন্ত্র মাত্র। এটি কিন্তু মাইজভাণ্ডারী গান বাজনার যন্ত্র নয়। মাইজভাণ্ডারী গান অন্তরে বাজতে হবে। এটি মাইকে বাজানোর কোন প্রয়োজন নাই। মাইজভাণ্ডারী গান বাজতে হবে অন্তরে। কিন্তু এখন আমরা মাইজভাণ্ডারী গানকে ট্রান্সফার করে দিয়েছি মাইকের ভিতরে। এটি করা উচিত নয়। এ কয়েকটি বিষয়ে ও কিছু কিছু জায়গায় আসলে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। দরবারে আসার পরে যার যার সুবিধা অনুযায়ী, সময় অনুযায়ী সবাই জমায়েত হবেন। ১০টার পর থেকেতো ঘোষণা হয়েছে কেন্দ্রীয় মাহফিল চলবে। ইনশা'আল্লাহ্ যতক্ষণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন। এর মধ্যে যা সময় পাবেন গঠনমূলকভাবে সময়টা কাটাবেন। গল্প-গুজবে নয়। ভ্রাতৃ সম্মেলনে ভাইয়ে ভাইয়ে দেখা হবে কুশল বিনিময় হবে। কিন্তু কোনভাবেই যেন গল্প-গুজবের মধ্যে সময় পার হয়ে না যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঠিক আছে আমি এক গ্রুপে এসেছি, আমার গ্রুপের সাথে বসে আপ্যায়নসহ সবকিছু দায়িত্ব একে অপরে ভাগ করে নিয়ে আমার মত করে আমি ইবাদত বন্দেগীতে চলে গেলাম। এইভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। জিকির আজকার মিলাদ মাহফিল, নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, সেমা মাহফিলে মনোনিবেশ করতে হবে। তবে শুধু সেমা মাহফিলের মধ্যে আমাদেরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা ঠিক হবেনা। কারণ এখানে এসেছি আমরা আমাদের বৃহত্তর পর্যায়ে কিছু অর্জনের জন্য। সেমা মাহফিল দরবারের খাস একটি বিষয়। এদিনের জন্য এটি আরও খাস। সাথে সাথে আমার আরও আমল আছে, সেগুলো আমাকে একটি একটি করে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। যত বেশি করতে পারি ততই আমার একাউন্টে জমা হয়ে যাবে।

আমি আগেও অনুরোধ করেছিলাম আপনারা একটি করে হাদিয়া আনবেন ১০ পৌষে। এইবার অনুরোধ করছি, আপনারা সব কমিটি বা যে কেউ একটিও হাদিয়া আনবেন না। ১০ পৌষে একজন কেউ কোন হাদিয়া আনবেন না। আমি আশা করি যে বিষয়টি এখন পরিষ্কার হয়েছে। কারো কোনো মানত থাকে নিয়ত থাকে ১০ মাঘের জন্য এটি রেখে দেওয়া হোক কিংবা ২৬ আশ্বিন এর জন্য সেটি রেখে দেওয়া হোক। ১০ পৌষে কোনো হাদিয়া আপনার কমিটির তরফ থেকে কিংবা কারো কোন ব্যক্তিগত তরফ থেকে আপনারা আনবেন না। কিন্তু আপনারা সবাই আসবেন। দরবারের রীতি অনুযায়ী আপনারা জশন করে আসবেন, ঢোল বাদ্য বাজিয়ে আসবেন। আপনাদেরকে ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে রিসিভ করা হবে ইনশা'আল্লাহ্। দরবারের পূর্ণ ঐতিহ্য বজায় রেখে ওরশ মোবারকের যে সৌন্দর্য সে সৌন্দর্য সে পরিবেশ নিয়ে আমরা ১০ পৌষের মহান খোশরোজ শরীফ আমরা উদ্‌যাপন করবো ইনশা'আল্লাহ্। হাদিয়া না আনার জন্য বলেছি এ জন্য আপনারা নিরুৎসাহী হবেন না। আমি আগেও বলেছি, আমরা আরও বেশি করে হাদিয়া আনবো। আমি বলেছি হাদিয়া আনবেন না আপনারা। আমি এখন বলছি আরও বেশি করে হাদিয়া আনবেন। আপনারা সবাই মিলে অধিকসংখ্যক মানুষ মিলে নিজেরা হাদিয়া হয়ে আসবেন। কারণ মুনিবের কদমে উৎসর্গ হওয়াই আসল কথা। এর চাইতে উত্তম হাদিয়া আর কিছু হতে পারে না। আমরা এই বিশেষ দিনে, গরু নয়, মহিষ নয়, ছাগল নয় বরং নিজেকে হাদিয়া হিসেবে উৎসর্গ করবো ইনশা'আল্লাহ্। সেই মর্যাদা নিয়ে আপনারা সকলেই পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে দরবারে আসবেন ইনশা'আল্লাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই মহান দিনের সমস্ত আয়োজন-এন্তেজাম উপস্থিতি যেনো কবুল হয় এবং আমাদের দো জাহানের নাজাতের উসিলা হয়। বিশ্বঅলি হক ভাণ্ডারী (কঃ), হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) রূহানী নূরানী ফয়্যুজাত যেনো নসিব হয়। আমি আমার কথাগুলো শেষ করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

প্রতিযোগিতার বিষয়

কেরাত, হামদ, না'ত, মাইজভাণ্ডারী গান, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা / ছড়া আবৃত্তি চিত্রাংকন এবং কুইজ প্রতিযোগিতা

* **কেরাত :** পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত
* **হামদ ও না'ত :** প্রচলিত যে কোন একটি হামদ অথবা না'ত
* **মাইজভাণ্ডারী গান :** খ্যাতিমান কোন গীতিকারের গান করার সুযোগ থাকবে
* **নজরুল সঙ্গীত :** যে কোন একটি নজরুল সঙ্গীত
* **রবীন্দ্র সঙ্গীত :** যে কোন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত
* **কবিতা / ছড়া :** নিজ পাঠ্যপুস্তক হতে যেকোন কবিতা/ছড়া আবৃত্তি
* **চিত্রাংকন :** বিষয়- উন্মুক্ত (শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে)
* **কুইজ :** কুইজ প্রতিযোগিতায় সকল শিশু-কিশোর উন্মুক্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কুইজের উত্তর কুইজের শীটে লিখে আগামী ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ শুক্রবারের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে বর্ণিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে। থানাভিত্তিক ৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

প্রতিযোগিতার স্থান, তারিখ ও সময়: সকল প্রতিযোগিকে ৩ জানুয়ারি ২০১৪ শুক্রবার সকাল ৯.৩০ টার মধ্যে নগরীর নাসিরাবাদ সরকারী (বালক) উচ্চ বিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

প্রতিযোগিতার বিভাগ:

ক বিভাগ: প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি **খ বিভাগ:** তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি
গ বিভাগ: ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি **ঘ বিভাগ:** নবম থেকে এস.এস.সি/সমমান

* একজন প্রতিযোগি সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে (কুইজ / চিত্রাংকন ব্যতিত) অংশগ্রহণ করতে পারবে।

* প্রত্যেক প্রতিযোগিকে লিফলেটে বর্ণিত রেজিস্ট্রেশন ফরম পুরন করে শেষের পাতাটি ছিড়ে আগামী ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ শুক্রবার এর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

ফরম প্রাপ্তি ও জমা দেয়ার ঠিকানা

গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম
'বাতিঘর' চেরাগী পাহাড় মোড়, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরীফ, হামজারবাগ (বিবিরহাট), চট্টগ্রাম

* উল্লেখ্য, আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ শুক্রবার নগরীর নাসিরাবাদ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিশু-কিশোর সমাবেশে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

ব্যবস্থাপনায়:

মাইজভাণ্ডারী একাডেমী
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।
যোগাযোগ: ০১৮১৯-৬২১৪০৫, ০১৯১৯-৩০৭১৭০

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানা।
৩. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল।
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার।
৫. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্‌স্টিটিউট, পশ্চিম গোমদন্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৭. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, পশ্চিম ষোলশহর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বারমাসিয়া, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৪. জিয়াউল কুরআন ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা ও ইবাদাতখানা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, এয়াকুবদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
১৮. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্‌রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৯. মাদ্‌রাসা-এ-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হেফজখানা ও এতিমখানা, মনোহরদী, নরসিংদী।
২০. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ইসলামিক একাডেমি, হাইদগাঁও, পরিয়া, চট্টগ্রাম।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)।
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. যাকাত তহবিল।
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল।

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা।
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও ইবাদাতখানা।
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী।
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)।